পুরুষ।

যম।

নারদ।

মাণ্ডব্য।

সত্যবান।

দ্যুমৎসেন	সত্যবানের পিতা।
অশ্বপতি	সাবিত্রীর পিতা।
সনাতন	অলিক্ষরার স্বামী।
তুম্বুরু	মালাকার।

কঞ্চুকী, ঋষিগণ, তাপসকুমার, কাঠুরিয়াগণ,
দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী।

সাবিত্রী।

অলিক্ষরা	মাণ্ডব্যের পালিতা কন্যা।
মালবী	সাবিত্রীর মাতা।
শৈব্যা	সত্যবানের মাতা।
মালিনী	তুম্বুরুর স্ত্রী।

সপ্ত সতী, কাঠুরিয়া-স্ত্রী ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা।

পরমা প্রকৃতি তুমি, সতী তুমি, গতি তুমি সার।

(তুমি) চির মধুময় সোণার স্বপন, সুধা চির পিপাসার

তুমি সংসার তুমি প্রাণ,

অনাদি জীবনে আপন গান,

তুমি স্নেহ মায়া, পতি সুত জায়া, তুমিই জননী তার।

(তুমি) আপন অঙ্গে জড়িতা রঙ্গে জলদে বিজলী হার।

সাবিত্রী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—নগরপ্রান্ত।

কঞ্চুকী।

কঞ্চুকী। এক এক ক'রে সমস্ত ভাট দেশে ফিরে এলো। কেউ রাজকুমারীর পাত্র আন্‌তে পার্‌লে না। এত বয়স হ'ল, এমন অদ্ভুত ব্যাপার ত কখন দেখিনি। রাজার মেয়ে,—তায় রূপে লক্ষ্মী,—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার পাত্র মিল্‌লো না! কেন? কি দৈব-বিড়ম্বনায়? কোন্ বিধাতার কি প্রহেলিকাময়ী ইচ্ছায়? কন্যার ষোল বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয় হয় হয়েছে। কন্যার চিন্তায় রাজা ও রাণী একরূপ উন্মাদ ব'ল্লেই হয়। এরূপ অবস্থায় ভাটেরা অমনি অমনি ফিরে এসেছে শুন্‌লে, তাঁরা হতাশায় জ্ঞানশূন্য হবেন। কি বলি? কেমন ক'রে বলি? প্রতিদিন রাজা আমাকে ভাটেদের প্রত্যাগমনের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন, কিন্তু কোন্ মুখে বল্‌বো—মহারাজ, এ পৃথিবীতে আপনার কন্যার পাত্র নেই। যদি কোন দেবতা মানুষের মূর্ত্তি ধ'রে বিবাহ ক'র্‌তে আসেন, তবেই এ মেয়ের বিবাহ হবে, নতুবা উপায় নাই।

(তুম্বুরুর প্রবেশ।)

তুম্বুরু। যা বলে'ছো ঠাকুর!—আপনা আপনি মনের দুঃখে যা প্রকাশ ক'রে বল্‌ছো, সব ঠিক।

কঞ্চুকী। কে ও তুম্বুরু ?

তুম্বুরু। আর তুম্বুরু। বাপের বড় পুণ্যি ছিল, তাই মানে মানে যে তুম্বুরু সেই তুম্বুরু ফিরে এসেছি, নইলে জগঝম্পো হয়ে গিয়েছিলুম আর কি!

কঞ্চুকী। জগঝম্পো কিরে!

তুম্বুরু। আর কিরে! পিঠে অনবরত বাড়ি পড়্‌লে জগঝম্পোই বা কেন—ঢাক হয়ে যেতুম। কেবল "যঃ পলাতি স জীবতি" ক'রে, পালিয়ে এসে বেঁচেছি। শুন্‌লুম—দিদিরাণীর যে পাত্র সন্ধান ক'রে এনে দিতে পারবে, সে অর্দ্ধেক রাজ্য পুরস্কার পাবে। ভাবলুম—অল্প মেহনতে যদি বড় মানুষ হয়ে যাই, তা হ'লে বাজে খেটে মরি কেন ? এই না ভেবে কঞ্চুকী মশায়, পাত্রের সন্ধানে ত বেরুলুম।

কঞ্চুকী। তার পর ?

তুম্বুরু। তার পরে গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ,—সাত সমুদ্র তের নদী—কোন জায়গা খুঁজ্‌তে বাকি রাখ্‌লুম না। কোথাও পাত্র মিল্‌ল না। নানা কারণে প্রাণটা বড়ই চ'টে গেল। শেষে মনে ক'র্‌লুম—বয়স্থ পাত্র ত পাওয়া যাবেই না, অথচ পাত্র না পেলে আমার রাজ্যলাভও হচ্ছে না, এই না ভেবে কঞ্চুকি মশায়, এক বুদ্ধি ক'রে ফেল্‌লুম। আচ্ছা ঠাকুর, আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি। বল দেখি, পাত্রের বয়স কত হ'লে ভাল হয় ?

কঞ্চুকী। এই চব্বিশ পঁচিশ।

তুম্বুরু। উঃ! তা হ'লে ভারি লোকসান ক'রে এসেছি কঞ্চুকি মশায়, ভারি লোকসান করে এসেছি। হাতে পেয়ে পাত্র ফেলে দিয়েছি।

কঞ্চুকী। সে কিরকম ?

তুম্বুরু। চমৎকার—চমৎকার!

কঞ্চুকী। বলিস কিরে!

তুম্বুরু। খাঁটি চব্বিশ বছর।

কঞ্চুকী। আস্‌তে চায়?

তুম্বুরু। তার আর আসা আসি কি, আনলেই হ'লো।

কঞ্চুকী। দেখতে কেমন?

তুম্বুরু। পাঁচ মিশিলি—খানিকটে ফরসা, খানিকটে কাল, খানিকটে বা মেটে মেটে, খানিকটে বা চাঁপাফুলের মতন। কথা কয়—খানিকটে আধ আধ, খানিকটে ন্যাকা ন্যাকা, খানিকটে খোনা খোনা, খানিকটে বা কলকণ্ঠ। বুদ্ধি—খানিকটে নেই ব'ল্লেই হয়, খানিকটে টন্‌টনে। খানিকটে বেস্পতি, খানিকটে তুমি, খানিকটে আমি,—এই রকম।

কঞ্চুকী। এ সব কি ব'ল্‌ছিস্‌?

তুম্বুরু। বুঝতে পারছ না, তবে বলি শোন। পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যখন দেখলুম, একটাও পাত্র মিল্‌লো না, তখন গোটা চেরেক ছ বছরের ছেলে জোগাড় ক'র্‌লুম। ব'ল্‌ব কি কঞ্চুকি মশায়, যে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করি 'বে কর্‌বি?' সেইটেই বলে কর্ব্বো'। আমি মনে ক'র্‌লুম —এই বারে ঠিক হয়েছে। একেনে চব্বিশ বছর যখন পাওয়া গেল না, তখন চারটেয় চব্বিশ ক'রে নিয়ে যাই। এই না ভেবে চারটে ছেলেকে—একটাকে মাথায়, দুটাকে দু বগলে, আর একটাকে শিকে ক'রে গলায় ঝুলিয়ে আন্‌তে লাগলুম। বেশ আসছিলুম, চারটে ছেলেকে চুরি ক'রে বেশ গোছ-গাছ ক'রে আনছিলুম, পথে আস্‌তে আস্‌তে শিকে ছিঁড়ে গলার ছেলেটা টিপ ক'রে প'ড়ে গেল,—সামলাতে গিয়ে মাথার ছেলেটা টাউরি খেয়ে গড়াতে সুরু ক'র্‌লে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বগলও ফস্‌কে গেল। তখন এটা সামলাতে ওটা যায়, ওটা সামলাতে সেটা যায়। চ্যা ভ্যাঁ লেগে গেল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে হুলুস্থূল কাণ্ড!

যাদের ছেলে চুরি করে আনছিলুম, তারা না শব্দ শুনে 'মাভৈঃ মাভৈঃ' ক'রে আমার দিকে ছুটে এলো—আমিও অমনি 'বাবারে বাবারে' ক'রতে ক'র্‌তে দে ছুট।

কঞ্চুকী। বুঝতে পেরেছি—এইবারে থাম্‌।

তুম্বুরু। সত্যি কঞ্চুকি মশায়, রাজকুমারীর পাত্র ত চব্বিশ বছুরে একটা পাওয়া যাবেই না—এই রকম চার পাঁচটায় চব্বিশ চাও ত, যত চাও এনে দিতে পারি। কঞ্চুকি মশায়, সরে পড়, সরে পড়—ওই এক বাবা আসছেন। উনি বরাবর আমার সঙ্গ নিয়েছেন। উনি ধাড়ী বাবা,—ওঁর সঙ্গে দু-চারিটী খুচরো বাবাও আছেন। উনি যদি করেন 'মাভৈঃ', তাঁরা করেন 'মাস্ম ভৈষীঃ'—বাপ! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! কি বিভীষিকা!

কঞ্চুকী। কোন মহাপুরুষ যেন এদিকে আস্‌ছেন না?

তুম্বুরু। নিশ্চয়—মহাপুরুষ, তাতে আর সন্দেহই নেই। তবে কি জান কঞ্চুকি মশায়, ওঁকে যে বাগিয়ে গায়ে হাত টাত বুলিয়ে, তুমি রাজকুমারীর পাত্র ক'রে বস্‌বে, আর সেই সঙ্গে মজা ক'রে অর্দ্ধেক রাজ্য মেরে দেবে, সেটী হচ্ছে না।—সে গুড়ে বালি। ওঁর কাছে গিয়ে যেমন প্রস্তাব ক'র্‌লুম যে, বুড়ো ঠাকুর, একটী কন্যা আছে,—সেটীর ষোল বৎসর প্রায় হয়ে যায়, কাজেই বাপ মার ধর্ম্ম যায়, কেউ তাকে বে ক'রতে চায় না—তুমি সেটীকে বে কর না। শুনেই বুড়ো ঠাকুর ব'ল্লে 'ষোল বছরের মেয়ে?' আমি ব'ল্লুম—হাঁ দেবতা। 'কেউ বে ক'র্‌তে চায় না?' আমি বল্লু'ম—না দেবতা। তখন ঠাকুর মেয়ের রূপের কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌লে। আমি মনে ক'র্‌লুম, বুঝি ঠাকুর বাগে এলো। এই না ভেবে, দেদার রূপ বর্ণনা ক'র্‌তে লাগলুম। রূপের বর্ণনা শুন্‌তে শুন্‌তে ঠাকুরের চোক বুজে আসতে লাগ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টস্‌ টস্‌ জল—দেখ্‌তে দেখ্‌তে দমবন্ধ—পেট ফুলে ঢাক—গেল গেল—মনে

ক'র্‌লুম বুঝি ব্রহ্মহত্যা হ'লো! কাজেই ঠেলাঠেলি ক'র্‌তে লাগলুম। অনেক ঠেলাঠেলির পর হুম্ ক'রে এক দীর্ঘ নিশ্বাস। তার পর না উঠেই, আমাকে একেবারে—এই যেমন সেয়াকুলে কাপড় জড়ায়—এই এমনি ক'রে (কঞ্চুকীকে বেষ্টন) জড়িয়ে ধ'র্‌লে। বল্‌লে—তুম্বুরুরে! এতদিন কোথায় ছিলিরে!

কঞ্চুকী। হাঁ হাঁ—করিস কি—করিস কি!

তুম্বুরু। র'স, ভাল করে বুঝিয়ে দিই।

কঞ্চুকী। আরে গেল—ছাড়্ ছাড়্।

তুম্বুরু। শেষে জড়াজড়ি থেকে গড়াগড়ি—সেটা কি রকম দেখিয়ে দেবো?

কঞ্চুকী। যা, যা,—আর দেখাতে হবে না।

তুম্বুরু। যে আজ্ঞে—ঐ ঠাকুর আসছে, তা হ'লে জড়াজড়িটে ওঁর কাছেই দেখে নিয়ো। ওঁর শুনেছি নাছোড়বান্দা পিরীত। শুনেছি—একবার উনি শূলে বসেছিলেন!

কঞ্চুকী। শূলে বসেছিলেন?

তুম্বুরু। হাঁ—তা এম্‌নি কৌশল ক'রে বসেছিলেন যে, বসবামাত্রই ঘুম। হাজার বৎসরে সে ঘুম ভাঙ্গেনি।

কঞ্চুকী। শূল!—তবে কি উনি মহাতপা মাণ্ডব্য?

তুম্বুরু। এই—তবে ত তুমি সব খবর রাখ। ওই গো ঠাকুর, উনি আপনাকে দেখে এই দিকেই আস্‌ছেন। তুমি ওঁর সঙ্গে আলাপ কর, আমি পলায়ন করি।

[তুম্বুরুর প্রস্থান।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। আসুন দয়াময়!—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মাণ্ডব্য। বিষ্ণবে নমঃ।—আপনি কে?

কঞ্চুকী। অধীন—রাজকঞ্চুকী।

মাণ্ডব্য। মহারাজ কি রাজধানীতে অবস্থান ক'র্‌ছেন ?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে হাঁ প্রভু! কোথায় আপনার গমন হচ্ছে ?

মাণ্ডব্য। তীর্থ-পর্য্যটনে।

কঞ্চুকী। মহারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজগৃহে আপনার পদধূলি ভিক্ষা করি।

মাণ্ডব্য। পদধূলি নয় ব্রাহ্মণ,—মহারাজ অশ্বপতির ঘরই আজ আমার গন্তব্য তীর্থস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—রাজবাটী।

অশ্বপতি ও মালবী।

মালবী। মহারাজ, আর ত লোককে বুঝিয়ে রাখতে পারিনে।

অশ্ব। বিষয়টা কি মহিষি যে, লোকেরা তোমার কাছে বোঝবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়েছে ?

মালবী। লোকের উদ্‌গ্রীব হবার কারণ কি, মহারাজ কি জানেন না ? কন্যা যে ষোল বছর পার হয়। বাড়ীতে যে আসে, সেই জিজ্ঞাসা করে—রাজকুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, অথচ তাকে পাত্রস্থ করা হচ্ছে না কেন ?

অশ্ব। সে কি আমাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছে না মহিষি ? কিন্তু কি ক'রব, আমি ত চেষ্টার ক্রটী ক'র্‌ছিনি। সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন স্থান নেই, যেখানে সাবিত্রীর পাত্রের অনুসন্ধানে লোক না পাঠিয়েছি। নানা দেশ থেকে কত সুলক্ষণযুক্ত পাত্রও ত এলো, কিন্তু কেহই ত তোমার মেয়েকে বিবাহ ক'র্‌তে চায় না। তোমার মেয়ের অদৃষ্টে পাত্র জুটেও জুটছে না, তা আমি কি ক'রব ?

মালবী। এ কথা কি লোকে বিশ্বাস করে? তারা মনে করে, আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কন্যাকে কুমারী রেখেছেন।

অশ্ব। মনে যদি করে, তা হ'লেই বা কি ক'র্‌ব? লোকের মনের উপর আধিপত্য ক'র্‌তে পার্‌ব, এমন পুণ্যই বা কি ক'রেছি। যথার্থ কথা ব'ল্‌তে কি মহিষি, এক সাবিত্রীর জন্য আমার এত সৌভাগ্যেও সুখ নাই। সাবিত্রীর জন্য দিবারাত্র চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি জীবন্মৃত হয়ে অবস্থান ক'র্‌ছি। মনে মনে ভাবছি যে, কর্‌লুম কি? আঠার বৎসরের কঠোর সাধনায় দেবতার দ্বারে ভিক্ষা ক'রে, অশান্তি ঘরে নিয়ে এলুম! যৌবনস্থা কন্যা, কুমারী অবস্থায় চক্ষের উপর বিচরণ ক'র্‌ছে। চক্ষের উপর যেন পিতৃপুরুষের অধোগতি দেখ্‌তে পাচ্ছি। দশম বর্ষ পর্যান্ত বালিকাদের কন্যাকাল। মায়ের আমার সে কন্যাকাল বহুদিন উত্তীর্ণ। এখন দেখ্‌ছি কুমারীকাল পর্য্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে যায়। আমি নিজেই আমাকে কি ব'লে যে প্রবোধ দিব, তাই বুঝতে পার্‌ছি না; তা তোমাকে আবার কি প্রবোধ দিব প্রাণেশ্বরি! দেবতা-আরাধনায় কন্যাপ্রাপ্তি। যদি আমার ধর্ম্মলোপই তাঁর অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে বৃথা অনুশোচনায় ক'র্‌ব কি?

মালবী। তবে কি আমার সাবিত্রীর বিবাহ হবে না?

অশ্ব। হবে কি না হবে, বিধাতাই ব'ল্‌তে পারেন। আর যদিই বিবাহ হয়, তা হ'লেই, ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে হ'লেই বা ফল কি? আমাকে ত ধর্ম্মে পতিত হ'তে হ'ল।

মালবী। হা ভগবান্, এ কি বিড়ম্বনা! এমন সর্ব্বসুলক্ষণা ধীরা, সাধ্বী—এমন ভক্তিমতী—দেখ্‌লে বোধ হয় যেন সাক্ষাৎ কৈলাসেশ্বরী সতী কন্যারূপে আমার ঘরে অবতীর্ণা। আমার এমন কন্যা কি না পতিভাগ্যে বঞ্চিত!

অশ্ব। সে দুঃখ আর আমার কাছে ক'রে কি ক'র্‌বে? আর

আমার কাছে দুঃখ জানিয়েই বা লাভ কি? সর্ব্বসুলক্ষণা হয়েই ত মা আমাকে বিপন্ন ক'রেছেন। মা আমার শক্তিস্বরূপিণী, প্রভাতারুণবর্ণা, সকল কোমলতার আধার হয়েও তেজোময়ী। যে দেখে, তারই মনে দেবীভ্রমে ভক্তির উদ্রেক হয়। মাতৃজ্ঞানে সকলেই তার চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করে। এরূপ অবস্থায় তোমার মেয়ের কেমন ক'রে বিবাহ হয়? সাবিত্রী দেবীর আরাধনায় আমি এ কন্যারত্ন লাভ ক'রেছি। জানি না, দেবীর মনে কি আছে।

মালবী। দেবীর মনে কি আছে, সে বুঝতে কি আর এতকাল যায়? কুলরক্ষার জন্য পুত্রকামনায়, আপনি আঠার বৎসর ধ'রে কঠোর তপস্যায় সাবিত্রী দেবীর অর্চ্চনা ক'র্‌লেন, কোথা থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মা কিনা ওপর-পড়া হয়ে বর দিতে এলেন। আরে রাম রাম, দেবতারাও কিনা আমার অদৃষ্টে প্রতারক হ'ল! কুলধর্ম্ম-রক্ষার জন্য তপস্যা—পুত্রের কামনায় যজ্ঞ,—ফল হ'ল কিনা কন্যা! তা হোক, সাবিত্রীকে পেয়ে আমি শতপুত্রলাভের আনন্দ পেয়েছিলুম। কিন্তু মহারাজ, তাকে এ অবস্থায় দেখে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকি! চক্ষের উপর কুলনাশ কেমন ক'রে দেখি! পিতৃপুরুষের অধোগতি স্মরণ ক'রে প্রাণ আমার বড়ই কাতর হয়ে উঠেছে। মহারাজ, হতাশ হ'লে চল্‌বে না। এখনও সময় আছে। আর একবার চেষ্টা করুন। পাত্রের সন্ধানে আর একবার দেশ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন। অবশ্যই সাবিত্রী দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

অশ্ব। আমি কি নিশ্চিন্তই আছি প্রাণেশ্বরি! আবার আমি দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়েছি। দেখি তারা কতদূর কি ক'রে ওঠে। তারা যখন না পার্‌বে, তখন নিজে আমি একবার পাত্রের সন্ধানে বহির্গত হব। তাতেও যদি না হয়, তখন কুলধর্ম্ম-রক্ষার জন্য শাস্ত্রের যে আদেশ, তাই পালন ক'র্‌ব।

মালবী। কি ক'র্‌বেন ?

অশ্ব। কি ক'র্‌ব,—কি ক'র্‌ব—মালবি, জিজ্ঞাসা ক'রোনা। রমণী তুমি—কোমলা। তুমি সে কঠোর বাক্য শোন্‌বার যোগ্য নও।

মালবী। তবু শুনি।

অশ্ব। সে বাক্যের একটী একটী অক্ষর, সহস্র বজ্রের বলে তোমার কোমল বক্ষে আঘাত ক'র্‌বে। মালবি, তুমি সহ্য ক'রতে পার্‌বে না।

মালবী। যখন সে কার্য্য ক'র্‌বেন, তখন যদি সহ্য ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে এখন শুনে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ব না কেন ?

অশ্ব। শাস্ত্রে ব'লেছে—কুলরক্ষার জন্য যদি লোক পরিত্যাগ করতে হয়, তা হ'লে লোক পরিত্যাগ ক'র্‌বে। গ্রামের জন্য কুল ত্যাগ ক'র্‌তে হয়, কুলত্যাগ ক'র্‌বে। দেশের জন্য যদি গ্রাম ত্যাগ প্রয়োজনীয় হয়, ত গ্রাম ত্যাগ ক'র্‌বে। আর আত্মার জন্য যদি পৃথিবী পরিত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহ'লে যে দণ্ডে আত্মার বিভীষিকা উপস্থিত হবে, সেই দণ্ডেই এই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবে না। রাণি ! সাবিত্রীর জন্য যদি কুলধর্ম্মনাশের সম্ভাবনা দেখি, তাহ'লে অমন সোণার মেয়েকেও আমাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে !

মালবী। হা ভগবান্, এই কি স্বামীর আমার কঠোর তপস্যার পরিণাম ! মহারাজ, সমগ্র রাজ্য যৌতুক দেবার ঘোষণা দিয়ে পাত্রের সন্ধান করুন না কেন ?

অশ্ব। রাণি ! সাবিত্রীকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্ত্তে সমর্থ, সে কি তুচ্ছ রাজ্যের ভিখারী।

(দূতের প্রবেশ।)

অশ্ব। কি সংবাদ ?

দূত। সংবাদ শুভ নয়। সমস্ত ভাট বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে।

মালবী। সমস্ত ভারতের মধ্যেও আমার কন্যার একটা পাত্র মিল্‌ল না?

দূত। রাজপুত্রদের উন্মত্ততার সংবাদ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে? কোন রাজপুত্র রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় না। কোন রাজাও আপন সন্তানকে মদ্রদেশে পাঠাতে চায় না।

অশ্ব। তাহ'লে কন্যার বিবাহের আশা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি।

দূত। তাই ত কার্য্যতঃ দেখছি মহারাজ! এত বয়স হ'ল, এরূপ বিচিত্র ব্যাপার ত কখন দেখিনি! ভাটেরা ব'ল্লে—মায়ের নাম শোন্‌বা-মাত্রই লোকে সেই দূরদেশ থেকে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করে। কেউ কি তাহাদের কাণে ব'লে দেয় যে, দেবী আমাদের ঘরে কন্যারূপে অবস্থান ক'র্‌ছেন?

মালবী। তা হ'লে কি হবে? মহারাজ, কি হবে? মহারাজ, দাসীর প্রতি দয়া করুন। মায়ের প্রাণ—অভাগিনীর মায়ের প্রাণের দিকে একবার দয়া করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

অশ্ব। দারুণ কর্ত্তব্য—প্রজারঞ্জন, লৌকিকতা-ধর্ম্ম-রক্ষা। বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনের সমস্ত সাধ আকর্ষণ ক'রে, অকুল দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'র্‌বার জন্য, আমার কামনার শাস্তি দিতেই যেন বিধাতা আমার গৃহে এ কন্যা পাঠিয়েছেন।—সোৎসুক নয়নে সমস্ত প্রজা আমার পানে চেয়ে আছে। আজ আমা হ'তে যদি সমাজ-ধর্ম্মনাশ হয়, তাহ'লে সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে। মানুষ একে স্বভাবতই স্বাধীনতাপ্রিয়। সুতরাং তারা যদি একবার আমার আচার দেখে প্রশ্রয় পায়, তা'হলে অল্পদিনের মধ্যে কুলস্ত্রীগণ আপন আপন মর্য্যাদার হানি ক'র্‌বে। বর্ণ-সঙ্করের সৃষ্টি হয়ে পাপের প্রখর স্রোতে চক্ষের নিমেষে সমাজ ধ্বংস-প্রাপ্ত হবে।

মালবী। মহারাজ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণও ত আপনার

সহায় আছেন। এ দারুণ-বিপত্তি সময়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হো'ন না কেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চুকী। মহারাজ, মহাতপা মাণ্ডব্য ঋষি আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেছেন।

অশ্ব। মালবি, সত্বর ঋষিরাজের জন্য পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো। মা জগদীশ্বরী এতদিন পরে সন্তানের প্রতি কৃপা-কটাক্ষে চেয়েছেন। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও।

[প্রস্থান।

মালবী। নারায়ণি! মা! এ কুলক্ষয়রূপ মহাপাতক হ'তে স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য—অলিন্দ্য।

মাণ্ডব্য।

মাণ্ডব্য। তাইত ভাবি, এ কি বিচিত্র ঘটনা! প্রতি প্রভাতে যথারীতি স্নানান্তে আহ্নিক করি, তথাপি প্রাণে তৃপ্তি পাই না কেন? আমি নিজেই কি যথারীতি দেবার্চ্চনা ক'রতে অসমর্থ হ'য়েছি; না নিত্য নিত্য এ তৃপ্তি আমার, কোন নিশাচর কিংবা নিশাচরী কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে। প্রতিদিন চিন্তা ক'রেছি, কিন্তু কোন উপায়েই এতদিন আমার এ ভাবনার মীমাংসা হয় নি। ধ্যানান্তে উন্মীলিত চক্ষে ভগবতী গায়ত্রীর চিদাভাস দেখতে আকাশপানে চেয়েছি, দেখি আকাশস্থল ম্লান! —প্রাণের আবেগে নবোদিত অরুণের অভ্যন্তর অনুসন্ধান ক'রেছি, দেখি আদিত্য-হৃদয়ে জবাকুসুমসঙ্কাশা দ্যুতিময়ী ভুবনোজ্জ্বলকরী কুমারীশ্রীর

কিরণময় সিংহাসন শূন্য! প্রাণের যাতনায়, মায়ের অনুসন্ধানে আমি ভুবন প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি, সমস্ত পরিশ্রম নিষ্ফল। মা যে আমার ধ্যানের সীমান্তে অবস্থান ক'র্‌ছেন, তা কেমন ক'রে জানবো? কিরণ-মালিনি! বেদরূপা জননি! অধম সন্তানকে লুকিয়ে ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে তুমি যে মদ্ররাজগৃহে অবস্থান ক'র্‌ছ, তা ত জান্‌তুম না মা! কিরণ-ময়ী আজ পতিব্রতা মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য মানবী-মূর্ত্তিতে ধরায় অবতীর্ণা। মা, মা, ইষ্টদেবি সাবিত্রি! অধম সন্তান আজ তোর মানবী মূর্ত্তি দেখ্‌তে এসেছে। দেখা দিবি কি মা? কন্যা হয়ে মদ্ররাজের ঘর কেমন ক'রে আলো ক'রে আছ, দেখ্‌বার জন্য প্রাণে আমার বড়ই অস্থিরতা। মা! দেখা দে, দেখা দে।

(অশ্বপতির প্রবেশ)

অশ্ব। আসুন দয়াময়, আসুন, এ দাসের গৃহ পবিত্র করুন।

[প্রণাম।

মাণ্ডব্য। জয়োঽস্তু মহারাজ!

(মালবীর প্রবেশ ও পত্র পুষ্প মাণ্ডব্য-চরণে প্রদান)

সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হো'ক মা, চিরায়ুষ্মতী হও।

মালবী। প্রভু, আসনে উপবেশন করুন।

মাণ্ডব্য। এই যে বস্‌ছি মা, তার জন্য ব্যস্ত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি মা, ত্রিলোক-বিশ্রুতা ধর্ম্মরতা। তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ, অতিথির বহুভাগ্যের কথা। মহারাজ! আমি বহুদেশ, বহুরাজ্য, বহুতীর্থ পর্য্যটন ক'রে এই পথ দিয়ে পুণ্যতীর্থ কাশী গমন ক'র্‌ছিলুম। পথে আস্‌তে আস্‌তে শুনলুম—তোমার গৃহে পবিত্রা ভক্তিময়ী, সদনুষ্ঠান-চারিণী, ষোড়শী কুমারী অবস্থান ক'রছেন। শুনেই বুঝ্‌লুম, মা অন্নপূর্ণা যখন নিকটেই, তখন তাঁকে দর্শন ক'রতে আবার অতদূরে যাবার প্রয়োজন কি?

অশ্ব। বলেন কি প্রভু!

মাণ্ডব্য। শাস্ত্রসম্মতা কুমারী যদি ষোড়শী হন, তিনি স্বয়ং অম্বিকা। তিনি পার্থিব জীবনে, নারীদেহে মাতৃ-মূর্ত্তি। সর্ব্বজীবের—সর্ব্ব মানবের এমন কি, সর্ব্বদেবতারও নমস্যা। এমন কন্যাকে যিনি বিবাহ করেন, তিনি নরদেহে উমাপতি। মহারাজ! আপনি গিরিপতি হিমালয় তুল্য ভাগ্যবান্। মা মদ্ররাণি! তুমিও উমাজননী মেনকার ন্যায় মহাভাগ্যবতী।

অশ্ব। বলেন কি প্রভু, এ সব কি কথা! আমি যে আপনার এ অদ্ভুত লোমহর্ষণকর বাক্যে জ্ঞানশূন্য।

মাণ্ডব্য। আমি শাস্ত্র-কথাই ব'ল্‌ছি মহারাজ।

মালবী। আপনার কোন্ শাস্ত্র মান্‌বো দেবতা? আপনি এখন দেবী দর্শন ক'র্‌তে কাশী যাওয়া বন্ধ ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা কিন্তু যে দেবীর জ্বালায় যাই!

মাণ্ডব্য। সে কি রকম মা? মা কি আমার চঞ্চলা?

মালবী। চঞ্চলা হ'লেও দুঃখ ছিল না। মা যদি আমার যথার্থই দেবী হন, তাহ'লে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তি ধ'রে এলেও, আমি বুকের ধন বুকে তুলে নিতুম। যদি মা আমার এ অভাগিনীর ঘরে আস্‌বার সময়ে দয়া করে তাঁর দেবাটীকেও তাঁর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেন! আপনার দেবী যে এখন আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ ক'রতে ব'সেছেন।

মাণ্ডব্য। এসব কি ব'ল্‌ছ মা, আমি যে সম্যক্ প্রণিধান ক'র্‌তে পার্‌ছি না।

অশ্ব। ঠাকুর, কন্যাদায়ে অস্থির হয়ে প'ড়েছি।

মালবী। ঠাকুর, শত চেষ্টা ক'রেও, সাবিত্রীর আমার বর জুট্‌লো না। কি হবে দেবতা? কি ক'রে ধর্ম্ম রক্ষা হয়। কি ক'রে লোক নিন্দার হাত থেকে নিস্তার পাই!

মাণ্ডব্য। বর জুট্‌লো না! মা কি আমার কুৎসিতা?

মালবী। বড় কুৎসিতা ঠাকুর, বড় কুৎসিতা। আপনাদের শচী, লক্ষ্মী, সরস্বতীই বা কি কুৎসিতা!—আপনাদের উমারাণীই বা কত কুৎসিতা? অন্তর্য্যামী ঠাকুর, প্রাণের যাতনায় কাতর হয়ে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌লুম, আপনিও কিনা সময় বুঝে রহস্য কর্ত্তে এলেন। মা আমার কুৎসিতা? ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য মা আমার ক্ষুদ্র দেহে আয়ত্ত ক'রেছে—সে মা আমার কুৎসিতা?

মাণ্ডব্য। ভাল, মাকে একবার আন দেখি। দেখে শুনে বুঝে দেখি, ব্যাপার খানা কি!

অশ্ব। যাও মহিষী, শীঘ্র সাবিত্রীকে এখানে নিয়ে এস।

মালবী। ও সব ব্যাপার বোঝাবুঝি আমি বুঝি না। যখন কৃপা ক'রে আপনার দাসদাসীর গৃহে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন আমাদের একটা গতি না ক'রে পায়ে ঠেলে যে চলে যাবেন, সেটী হচ্ছে না।

অশ্ব। ভাল, আগে সাবিত্রীকে নিয়েই এস, তার পর যা বল্‌বার ব'লো।

[মালবীর প্রস্থান।

মাণ্ডব্য। (স্বগত) মায়ের আগমনবার্ত্তা জানবার জন্য প্রাণে বড়ই কৌতূহল জেগে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী—সাবিত্রী—কি সুন্দর নাম! এ নাম কোথা পেলে মহারাজ?

অশ্ব। সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ক'রে মাকে পেয়েছি, তাই সাবিত্রীর প্রসাদস্বরূপ কন্যার নাম রেখেছি সাবিত্রী।

মাণ্ডব্য। যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে ঘটনাটা জানতে পারি কি?

অশ্ব। আপনি গুরু; আপনার কাছে ব'ল্‌তে বাধা কি? পুত্র-কামনায় আমি কুলদেবতা সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করি। আঠার বৎসরের তপস্যায় দেবী দাসের প্রতি প্রসন্না হন। অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আমাকে বর গ্রহণ ক'র্‌তে আদেশ করেন। আমি

ধর্ম্মরক্ষার্থ মায়ের কাছে কুলোজ্জ্বল পুত্র কামনা করি। দেবী সেই কথা শুনে ব'লেছিলেন—"তোমার অভিপ্রায় পূর্ব্ব হ'তেই অবগত হ'য়ে আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট তোমার জন্য পুত্র প্রার্থনা করি। তিনি তোমাকে একটী কন্যা দান ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। মহারাজ, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, অচিরে তুমি একটী তেজোময়ী কন্যা লাভ কর। দ্বিরুক্তি না ক'রে এই মুহূর্ত্তেই তুমি গৃহে প্রতিগমন কর।" এই কথা বলেই দেবী দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্তর্দ্ধান হইলেন। গৃহে ফিরে এলুম। মায়ের আশীর্ব্বাদের ফলে অচিরেই এক কন্যারত্ন লাভ ক'র্‌লুম। বল্‌ব কি দেবতা! জগতের সকল সৌন্দর্য্য একত্র হয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার গৃহে নয়নানন্দকরী নব তিলোত্তমারূপে প্রস্ফুটিত হ'লেন। কিন্তু দুঃখের কথা কি বল্‌ব প্রভু! ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হ'তে চল্‌লো, তথাপি আজও পর্য্যন্ত মাকে পাত্রস্থ কর্‌তে পার্‌লেম না।

মাণ্ডব্য। এমন কন্যার পাত্র মিল্‌ল না!

অশ্ব। বহুপাত্রের সন্ধান ক'রেছি, বহু সুলক্ষণযুক্ত যুবাকে কন্যা দান কর্‌বার জন্য গৃহে এনেছি; কিন্তু লজ্জাভার-নমিতাঙ্গী কুমারীকে আজও পর্য্যন্ত কোনও পুরুষ প্রেমচক্ষে দেখ্‌তে সাহস করেনি। অদ্যাবধি যত রাজপুত্র বিবাহার্থী হয়ে এসেছে, সকলেই আমার কন্যাকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তিসহকারে দূর থেকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করে।

মাণ্ডব্য। পাত্র মেলেনি ব'লে, গৌরী কিনা আজও পর্য্যন্ত কুমারী! তা মহারাজ, এতদিন চেষ্টা ক'রেও তোমরা নিজে যখন কিছু ক'রতে পারনি, তখন মাকে নিজের উপর পতি-নির্ব্বাচনের ভার প্রদান কর নি কেন?

অশ্ব। তাই ত প্রভু! একথা ত এক সময়ের জন্যও আমার মনে উদয় হয় নি।

মাণ্ডব্য। শুভদিন শুভক্ষণ দেখে, যত শীঘ্র পার, মাকে পতি-অন্বেষণে প্রেরণ কর। আশীর্ব্বাদ করি, মহারাজ, আপনার গৃহে শান্তি ও ধর্ম্ম চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হো'ক।

(মালবী ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। (স্বগত) আসছিস্ মা আনন্দময়ি! সন্তানের আকুল আগ্রহের কাতর স্বর তোর কাণে কি পৌঁছাল মা! মহেশবদনোৎপন্না, বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা, বেদপ্রসবিত্রী গায়ত্রী! দিবাকরের হৃদয়-আসন শূন্য ক'রে—মদ্ররাজগৃহে প্রচ্ছন্নবেশে—অবলা-বালিকাসুলভ কোমলতায় কার প্রাণ গলাতে এসেছ মা? মা! দূর হ'তে অধম সন্তান তোমার চরণারবিন্দে কোটী কোটী প্রণাম করে। তুমিই না হয় কন্যারূপিণী—পিতা মাতার মমতাজালে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বিস্মৃত হ'য়েছ। তাতে আমার কি জননি! আমি তোমার সঙ্গে আত্মবিস্মৃত হ'তে যাব কেন? মা, আবার—আবার—বারবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মালবী। এই নিন প্রভু, আপনার দাসী। মা, ঠাকুরকে প্রণাম কর। প্রণাম ক'রে পদধূলি মাথায় নিয়ে, ঠাকুরের কাছে স্বামি-সৌভাগ্য প্রার্থনা কর। বল—যেন মনোমত পতিলাভ করি, যেন আমা হ'তে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম রক্ষা হয়। (সাবিত্রীর প্রণাম)

মাণ্ডব্য। বেটী! চুপ ক'রে থাকবে মনে ক'রেছো? কল্যাণরূপিণি! শুধু কি নয়নেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতায় আত্মার তৃপ্তি হয়। যে বিম্বোষ্ঠের ঈষৎকম্পনে চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি হয়েছে, অক্ষরময়ি! সেই তুমি, আমার পিপাসু আত্মার সমীপস্থ হয়ে নীরব থাকবে! দেখি বেটী, সন্তানকে ছলনা ক'রে কতক্ষণ থাকতে পার!

মালবী। কি মা, ঠাকুরের কাছে বর প্রার্থনা না ক'রে নীরব রইলি যে?

মাণ্ডব্য। নীরব কি সাধে থাকে! মহারাজ, এখন বুঝতে পেরেছি যে, এ কন্যার বিবাহ হয় না কেন। বোবা মেয়েকে কে বে ক'র্‌বে!

মালবী। ও সাবিত্রি, কথা কওনা মা!

অশ্ব। মা, দেবতার কাছে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। প্রভু শাস্ত্রে শুনেছি—কামনা ত্যাগ ক'রে ভগবানের আরাধনাই হচ্চে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। যদিই বা কামনা কর্‌তে হয়, তা হ'লে অগ্রে দেবতার যথাশক্তি আরাধনা করা প্রয়োজন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে যদি দেবতা স্বেচ্ছায় বর প্রদান করেন, তা হ'লে সেই আরাধনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মাধর্ম্ম। নতুবা ভিক্ষা দেবতার কাছেও নিন্দনীয়। তবে এও শুনেছি—জনক জননীর বাক্য বেদস্বরূপ; আজ্ঞা, শাস্ত্রের আদেশের ন্যায় অলঙ্ঘনীয়। যে পিতা মাতার আদেশ লঙ্ঘন করে, সে দেবাসনে উপবিষ্ট হ'লেও ধর্ম্মে পতিত হয়। তাই আজ জননী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমা হ'তে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম নষ্ট না হয়।

মাণ্ডব্য। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের উপর আশীর্ব্বাদের যেটুকু অধিকার দিয়েছেন, তাইতে বলি, মা তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হোক।

মালবী। আরাধনা ক'র্‌তে পাওনি বলে দুঃখু? তার জন্য দুঃখু কি মা! তুমিই না হয় আজকে এই অতিথি সেবার ভার গ্রহণ কর।

অশ্ব। সাবিত্রি, কাল পর্ব্বাহে তুমি উপবাসিনী ছিলে, সুতরাং আজ এই দেব অতিথির সৎকার ক'রে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ কর। আর শোন—তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা ক'র্‌ছেন না। অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণসদৃশ স্বামী অন্বেষণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হবেন, আমার কাছে তাঁর কথা নিবেদন ক'রো; পরে আমি বিবেচনা ক'রে তোমাকে সম্প্রদান ক'র্‌ব। কল্যাণি! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে যে বচন পাঠ ক'র্‌তে

শুনেছি, তা তোমাকে ব'ল্‌ছি শোন—যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিন্দনীয় হন; যে সংসারী বিবাহ না করেন, তিনিও নিন্দার্হ হন; আর যে পুত্র স্বামিহীনা জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিন্দাভাজন হয়ে থাকে। তুমি আমার এই কথা শুনে, যত শীঘ্র পার, স্বামীর অন্বেষণ কর; যাতে আমি দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাই কর। আজই শুভদিন। আমি তোমার যাত্রার উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ক'র্‌তে আদেশ প্রদান করি।

সাবিত্রী। কোথায় যেতে আদেশ করেন?

অশ্ব। তোমার ধর্ম্ম যেখানে তোমায় আকৃষ্ট করে নিয়ে যাবে, সেই খানেই যাবে। ফল কথা, স্বামীর সংবাদ না গ্রহণ ক'রে তুমি আর ঘরে ফিরো না। যদি অকৃতকার্য্য হও, তা হ'লে মদ্রবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

(পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত।)

তবে যাও তবে যাও আসিতে।
একা চ'লে সরলে যুগলে ফিরিতে।
বাঁধি গলে গলে বাহুলতা-হারে,
অচেনা দেশ হ'তে আন ধ'রে তারে,
সে প্রিয় মোহন মন মোহিতে।—
সুখ-বারিদ-প্লাবিত সরে ভাসিতে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—পথ।

তুম্বুরু ও মালিনী।

তুম্বুরু। দেখ্ দেখি বউ, কি ক'র্‌লি! রাজকুমারী বনবাসে চ'লেছে ব'লে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এলি, এখন কোথায় এসে পড়্‌লি বল দেখি। আর পথ চিন্তে পার্‌ছিনি।

মালিনী। কি ক'র্‌ব? আমি স্ত্রীলোক, চ'লেই না হয় এসেছি; তুই পুরুষ মানুষ, তুই পথ ঘাট চিন্‌বিনি—তা আমি কি ক'র্‌ব?

তুম্বুরু। বেশ, আয় তবে পথের মাঝখানে দু'জনে হাত পা মেলিয়ে মরি।

মালিনী। দিদিরাণী যে দণ্ড থেকে আমাদের ত্যাগ ক'রে এসেছে, সে দণ্ড থেকে আমরা কি বেঁচে আছি! তা আর মরণের ভয় দেখাচ্ছিস্ কি? ভয় হোগ্‌গে তোর। আমি ত তোকে রেখে মরতে পার্‌লে বেঁচে যাই।

তুম্বুরু। ভারি সুবিধের কথাটাই কইলি! ক্ষিদেয় নাড়ী ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌ছে—তেষ্টায় প্রাণ টা টা ক'র্‌ছে,—তার ওপর অর্দ্ধেক রাজ্যটা পেতুম, সেটা হ'লো না ব'লে মন খাঁ খাঁ ক'র্‌ছে। নিজে নিজেকে নিয়েই নড়্‌তে পার্‌ছিনি, এমন সময় তুমি মলে এই সারা পথটা তোমায় কাঁধে ক'রে নিয়ে বেড়াই। ভারি সুখের কথাই কইলি বউ!

মালিনী। বলিস্ কি মিন্‌সে, এত দয়া!

তুম্বুরু। না বউ, মর্‌বার কথা বলিস্‌নি। অনেক দিন তোর মিষ্টি

মিষ্টি গালাগালি খাইনি। গালাগালের সাধ এখনও আমার মেটেনি। আগে দিদিরাণীকে খুঁজে বা'র করি, তার পর মরতে হয় তুজনেই এক সঙ্গে মরা যাবে। এখন ক্ষিধেয় মরি তার কি? সঙ্গে ক'রে কতকগুলো চিঁড়ে এনেছিলি, দে না।

মালিনী। শুধু চিঁড়ে কেন হাড়ের মতন চিবিয়ে খাবি, একটু অপেক্ষা কর্—পথের ধারে আস্তে আস্তে একটা গরু চর্তে দেখে এলুম—রোস্ সেইটেকে টেনে এনে দিই।

তুম্বুরু। যা, তা হ'লে আর দেরি করিস্‌নি। (মালিনীর প্রস্থান) না বাবা, আর নয়, চেষ্টার চূড়ান্ত হয়েছে। রাজা রাজকুমারীকে এক রকম বনবাসেই দিয়েছে। বর মেলে ত দিদিরাণী দেশে ফির্‌বে, নইলে আর তাকে দেখ্‌তে পাব না। বউ তা হ'লে আমার আর দেশে ফির্‌ছে না। সে নিত্যি নিত্যি রাজকুমারীর শিবপূজোর ফুল যুগিয়ে এসেছে। তার এতদিনের ফুল যোগান বৃথা হ'লো। দিদিরাণীকে দেখ্‌তে না পেলে সে কি বাঁচ্‌বে!—অমনিতেই ত সে আধমরা হ'য়ে আছে। আর অমন বউ গেলে কি ছাই আমিও আর বাঁচ্‌ব! আহা বউ ত নয়—যেন পৈতৃক বউ! দরদ কি!—মায়া কি!—যাক্ বাবা, ভাব্‌লে আর জ্ঞান থাকে না। কাজেই বউ যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এই চিঁড়ে কটার সাহায্যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাই। ও বাবা—আবার সেই মাভৈঃ এ দিকে আসছে যে! লুকুবো এমন জায়গাও ত নেই, কি করি? ও বাবা! এসে পড়্‌লো যে। তা হ'লে কি করি? দূর ছাই, কি আর ক'র্‌ব, তা হ'লে এই করি—(চিঁড়ে ভক্ষণ)।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)।

মাণ্ডব্য। মা আমার শুভক্ষণে পতি-অন্বেষণে গৃহ থেকে যাত্রা ক'রেছেন। মায়ের স্বামি-সম্মিলন যতক্ষণ না দেখ্‌তে পাচ্ছি, ততক্ষণ

কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না। একি! কে তুমি? পথের ধারে—গাছের তলায়—আধ আঁধারের ভেতর ব'সে, কে তুমি?

তুম্বুরু। ধ'রেছে, ঠিক ধ'রেছে। সুমুখে পেছনে চোক, ওর হাত এড়িয়ে যাবার যো কি!

মাণ্ডব্য। কে তুমি? কথা কচ্ছনা কেন?

তুম্বুরু। আমি।

মাণ্ডব্য। আমি কে?

তুম্বুরু। চিনে নাও।

মাণ্ডব্য। নাম কি?

তুম্বুরু। রাস্তা বন্ধ—গলা দিয়ে নাম বেরুবার পথ নেই।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, খাওয়া চল্‌ছে দেখে, কথাগুলো আস্‌বার সুবিধে পাচ্ছে না।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে এতগুলো কথা এলো কি ক'রে?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, কতকগুলো পিছলে এসেছে, আর কতকগুলো ঠোঁটের ডগায় এসে ব'সেছিল, ঠোঁট নাড়তেই বেরিয়ে প'ড়েছে।

মাণ্ডব্য। আর কেও—তুম্বুরু!

তুম্বুরু। আজ্ঞে, আর তুম্বুরু নেই, এখন ডুগ্‌ডুগি।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, প্রাণের তার ছিঁড়ে এখন বেসুরো মেরে গেছি দেবতা।

মাণ্ডব্য। তুমি ত রাজকুমারীর বরের সন্ধানে গিয়েছিলে?

তুম্বুরু। আজ্ঞে গিয়েছিলুম।

মাণ্ডব্য। তার পর?

তুম্বুরু। তার পর এই চিঁড়ে খাচ্ছি।

হলেও আকস্মিক তো। ঠিক ভয় না পেলেও কি মনে করে মাধবী দেখে নেয় তাদের দুজনের মধ্যে বসবার জায়গাটার দূরত্বটা কতখানি। না, সে রকম কিছু নয়, সঙ্গীটির মনে কিছু নেই এমনিই প্রশ্ন করেছে বোধ হয়।

মাধবী সহজভাবে বলে, কি আবার মনে হবে!—দুজনের প্রয়োজনেই তো আমরা এভাবে যাতায়াত করি।

সঙ্গীটি হাসে, আপন প্রশ্নের গুরুত্বটা হাসি দিয়ে যেন ঢেকে দিতে চায়।

মাধবী একটু যেন গম্ভীর হয়ঃ কেন দোষের কিছু আছে না কি?

সঙ্গীটি বলে, না না, দোষ থাকবে কেন —এমনি জিগ্যেস করছি!

মাধবী জানালার বাইরে মুখ নিয়ে চুপ করে থাকে। সঙ্গীটি আপন মনে বলে, আমার কিন্তু ভারি আশ্চর্য লাগে একসঙ্গে এতবার আমরা এলুম-গেলুম, কেউ কারো পরিচয়টা পর্যন্ত জানলুম না আজো। প্রয়োজনটা শুধু আমাদের কাছে বড় হয়ে আছে! ভারি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?

মাধবী মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়নি। ওর অদ্ভুত লাগলে তার বলবার কি আছে। অনেকক্ষণ পরে হাসপাতাল গেটের সামনে রিক্সা থেকে নেমে মাধবী বললে, যাতে আর আশ্চর্য না লাগে, অদ্ভুত মনে না হয়, তার ব্যবস্থা কিন্তু এরপর আমাদের করা উচিত। প্রয়োজনটা তো আর আপনার কাছে বড় নয়!

সঙ্গীটি কিছু বলবার আগেই মাধবী এগিয়ে 'মেল-ওয়ার্ডে' ঢুকে পড়ল। একটু যেন ছুটলোও সে। সঙ্গীটি বুঝলেও না-বোঝার হতচেতনায় পা তুলতে পারে না। সত্যি, দোষের সে কিছু বলেছে না কি?

ফেরবার পথে অবশ্য মনটাকে সহজ করে নেওয়া যেতো, সুযোগ মত ক্ষমা চেয়ে নিলে চলতো, বক্তব্যটাকে খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে দিত, কিন্তু কই একসঙ্গে বাড়ি ফেরবার জন্যে মাধবী তো গেটে এসে দাঁড়াল না! না, কথাটা মাধবী গুরুতরভাবেই নিয়েছে —একসঙ্গে যাওয়া-আসার দোষটা গ্রহণ করেছে।

বাইরে এসে সঙ্গীটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে। হাসপাতালের টিনের চালের রোদ ঝেটিয়ে গেটের সামনে জড় হলো—রাস্তার ওপারে উলুবোন জ্বলে উঠল। একে একে সব রিক্সাগুলো ফিরে গেল। একটা অস্বস্তি-কর নীরবতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সঙ্গীটি অপরাধীর মত বৃথাই অপেক্ষা করলে। আরক্ত পশ্চিম আকাশ পাণ্ডুর হয়ে এল, উলুবন নিভে গেল। কে জানে নিছক প্রয়োজন ছাড়া আর কোন সম্বন্ধে সঙ্গীটির মেয়েটির সঙ্গলাভের প্রত্যাশা অন্যায় কি না! কত সহজ জিনিসটা কত সামান্য কথায় দুরূহ, দুর্বোধ্য হয়ে গেল! কে জানে আর কোনদিন মেয়েটিকে এর সহজ মানে বোঝান যাবে কি না, আর গেলেও সে বুঝতে চাইবে কি না! ভুলটা কোথায় বুঝেও সঙ্গীটি বুঝতে চায় না—এতে দোষের কি আছে? এতে ভয়ের কি আছে? এতে লজ্জারই বা কি আছে? আশ্চর্য!

সপ্তাহ দুয়েক পরে আবার একদিন উভয়ের মিলনের সুযোগ হয়। মেল-ওয়ার্ড থেকে ত্রস্ত পায়ে মাধবী বেরিয়ে এসে সবুজ ঘাসের লন পেরিয়ে ফিমেল ওয়ার্ডের চালার মধ্যে উঠে আসে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায় হন হন করে।

পরিচিত সঙ্গী ছেলেটির সামনে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ কি যেন করতে গিয়ে কি যেন করে ফেলেছে এমনিভাবে থমকে যায়। ওরা পাশাপাশি বসে তখন আলাপে অ্যামনস্ক। প্রথমে মাধবীকে এ অবস্থায় দেখল রুগ্ন মেয়েটি। দুজনে দুজনকে দেখে যেন বড় বিস্মিত, চকিত হয়েছে। হঠাৎ এভাবে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে কে এই মেয়েটি? চোখে ভয়, বিস্ময় আকুতি? সঙ্গীটি মুখ ফেরালে, যেন মাধবীকে সে চিনতে পারছে না—এর আগে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না! এক ভ্রূর জিজ্ঞাসায় তার নাসাগ্র স্ফুরিত, চোখের কোণ বক্র। অভিমানে দুঃখে মাধবীর বাক্‌রোধ হয়ে যায়।

রোগিণী জিগ্যেস করলে, কিছু বলবেন! তখনো মাধবী বিহ্বলতায় উত্তেজনায় নীরব। এদের কি বলবে সে? সত্যি, কেন সে এখানে এদের মাঝখানে এমন রসভঙ্গের মত ছুটে এল? এরা তো তার কেউ নয়।

রোগিণী আবার জিগ্যেস করলে, কাকে চাই আপনার?

মাধবী নিজেকে সামলে নিলে। মেয়েটিকে গ্রাহ্য না করে বললে, আপনি একটু এদিকে আসবেন দয়া করে।

সঙ্গী ছেলেটি কিন্তু কিন্তু করলে, আমাকে?

মাধবী ভাঙা গলায় চীৎকারের মত বললে, হ্যাঁ, আপনি আসুন শীগ্‌গির।

সঙ্গী জিগ্যেস করলে, কি ব্যাপার! কি হলো?

মাধবী ভেঙে পড়লঃ আমার আত্মীয়টি কেমন করছেন—দয়া করে আর-এম-ওকে যদি ডেকে দেন, আমি তাঁর কোয়ার্টার কোথায় জানি না। অবস্থা খুব খারাপ মনে হ'ল!

কৌতূহলী রোগিণী বললে, কার? ওঁদিকে তের নম্বর বেডের?

হ্যাঁ, বলে মাধবী এমনভাবে মেয়েটির মুখের ওপর চেয়ে রইল যা কোন সাহায্য-প্রার্থীর পক্ষে অমার্জনীয়। সন্দেহের কিছু মাধবী পেলে কি না কে জানে মেয়েটির নির্ভুল বেড নম্বরটা বলায়।

সঙ্গীটি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই যেন উঠে দাঁড়াল, উপবিষ্টা সঙ্গিনীকে বললে, তুমি বস, আমি একবার দেখে আসি—যদি কিছু এ'র করতে পারি!

উপবিষ্টা রোগিণী বললে, হাঁ, হা তুমি যাও—দেখ আর-এম-ও কোয়ার্টারে আছেন না রাউণ্ডে বেরিয়েছেন!

সঙ্গী দায় সারার মত বললে, দেখি ভদ্রমহিলার যদি কোন উপকারে আসতে পারি।

এ বিষয়ে রোগিণীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠাই যেন বেশী— উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, যাও যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—রাউণ্ডে বেরুলে ডাক্তারকে ধরতে পারবে না—সোজা চলে যাও, একেবারে এই শেডের শেষ সীমানায় বাঁ দিকের কোয়াটারটা তাঁর।

কে জানে, মেয়েটির আগ্রহ দেখে মাধবীর আর কোন সন্দেহ হয় কি না। নিজে রুগ্ন বলে বোধহয় আর একজন রোগীর প্রতি এতখানি দরদ দেখাচ্ছে।......

ফিরতি পথে দুজনে এক রিক্সাতে আবার ওঠে। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু দেরী হয়ে যায় ফিরতে। আলোছায়ায় অন্ধকার আসি-আসি করছে, ক্ষয়া চাঁদের মুখে আলো ফোটেনি—ঝিলের জল খাপে-ঢাকা-বাঁকা-তলোয়ার। আশপাশের বনবাদাড়ে অশরীরী একটা ভয় উঁকি-ঝুঁকি মারছে যেন।

সঙ্গী বললে, কি বিপদেই না আজ ফেলেছিলেন! আর একটু হলে—

মাধবী মুখ তুললে, সঙ্গীর মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলে না, কিন্তু বুঝতে পারলে সে হাসছে নিজে নিজে নিঃশব্দে। কিন্তু কেন?

মাধবী জিগ্যেস করলে, কি?

এবার হাসিটা সশব্দে হলো, কি আবার! মীরা জানতে পারতো আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছিলেন!

মাধবী বললে, ও। কিন্তু জানলে মুশকিলটা কি? জানাটা কি দোষের?

সঙ্গীর হাসি থামলো, বললে, না, তা নয়, তবে জানিয়ে লাভ কি। মনে কষ্ট করবে শুধু শুধু।

সহজ কণ্ঠে মাধবী বললে, কি করে আপনি জানলেন যে, সে কষ্ট করবে? আর কারো সঙ্গে পরিচয় হলেই বুঝি অমনি কষ্ট করতে হয় মেয়েদের!

সঙ্গী অপ্রস্তুতের মত বললে, না, তা নয় তবে—

শান্ত স্বরে মাধবীর জিগ্যেস করেঃ তবে কী? কষ্টটা এতই সহজ ভাবেন বুঝি!

হঠাৎ সঙ্গীটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। পাশ থেকে বাহুবেষ্টনে মাধবীর দেহটা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গদ গদ কণ্ঠে বললে, সহজ না হোক, শক্ত কিছু নয়—সেদিনের কথা আমার মনে আছে।

মাধবী নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে না। আবার নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতেও পারলে না, কাঠ হয়ে বিশুষ্ক কণ্ঠে বললে, ছাড়ুন. আঃ কি করছেন!

সঙ্গী বললে, যদি না ছাড়ি?

মাধবীর রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো না, ভয়ে ঘৃণায় আশঙ্কায় সে-পুরুষ বাহুবন্ধনের মধ্যে সঙ্কুচিত হলো, কাঁপতে লাগল থর থর করে।

সঙ্গীটি আর বেশীদূর অগ্রসর হবার সাহস করলে না। সামনে চাঁদের মুখের হাসিটা চোর ধরা আলোর মত, নিঝুম গাছপালায় নিঃশব্দ ছি ছিকার। মাধবীর দু চোখ ভেঙে অশ্রু নেমেছে, পাথরের মূর্তির মত সে স্থির হয়ে বসে আছে। সঙ্গীটি অন্যমনস্ক হবার জন্যে সিগারেট ধরালে।......

কয়েক সপ্তা অবনীর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ গেল। নতুন উপসর্গ দেখা দিল, কয়েকবার মুখ দিয়ে রক্তও উঠল। ব্যাধির দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে মাধবীর আর কোন সংশয় রইল না। চুপি সাড়ে এসে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে দেখা ছাড়া তার আর কিছু করবার রইল না। সব আশাভরসা নিঃশেষ হবার প্রতীক্ষায় শুধু এই দিন গোনা, নির্দায় কর্তব্য করা। নিয়মিত আসা-যাওয়ায় কেমন অবসাদ বোধ করে মাধবী আজকাল। হঠাৎ এমন অনর্থক বোধহয় সব।

যেন ভুলে থাকতেই কয়েক দিন পরে মাধবী আবার হাসপাতালের সঙ্গীর সঙ্গে এক গাড়িতে চড়ে, একই রিক্সায় রুগী দেখতে আসে। যথাসম্ভব দুজনে চুপচাপ থাকে। হঠাৎ সঙ্গীটিকে বড় নিরুৎসুক, শান্ত মনে হয়। একসঙ্গে এসে যেন নেহাৎ একটা উপকার করছে দায়ে পড়ে সে। বড় নিরীহ শান্তশিষ্ট লোকটি! মাধবী একদিন উপযাচক হয়ে জিগ্যেস করলে, আপনার আত্মীয়াটির অবস্থা কেমন? ভাল তো!

সঙ্গী নিরুৎসুক কণ্ঠে জবাব দিলেঃ কেন, ভালই তো—ভালই আছেন।

এর পর আর কি জিগ্যেস করবে মাধবী ভেবে পায় না। এক যাত্রায় পৃথক ফল, ওর রোগী সেরে আসছে আর তার রোগী দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। দুজনের রোগীই যদি খারাপ হতো, তাহ'লে যেন ভাল ছিল, বলবার কিছু থাকতো। তবু মাধবী জিগ্যেস করতে পারে না, হঠাৎ সঙ্গীর বিমর্ষ হবার কারণ কি, ভাল খবরে মন খারাপ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ মাধবী খুঁজে পায় না।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর হঠাৎ অবান্তরভাবে সঙ্গীটি বললে, আর ভাল লাগে না—ভাল হলেই বা কি আর না হলেই বা কি!

মাধবী কোন প্রশ্ন করবার আগেই সঙ্গীটি আবার বললে, একঘেয়ে। মিছিমিছি—

মাধবীর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কি মিছিমিছি, কি একঘেয়ে, বুঝতে তার বাকি থাকে না। সঙ্গীটি বলে কি? মেয়েটির সঙ্গে তাহ'লে সম্পর্ক ওর তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। অবনীর সম্বন্ধে মাধবী বোধ হয় অমন কথা বলতে পারবে না কখনো। ভালবাসার পাত্রকে কি এত সহজে ফেলে দেওয়া যায়? ছি, ছি।

সঙ্গী নিজের বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার করতেই যেন আপন মনে বলে, ভেবে দেখলে মিছিমিছি ছাড়া আর কি! পূর্ব সম্বন্ধের জের টানা কেবল। ও অসুখ আর সেরেচে!

মাধবী কোন উত্তর করে না। সঙ্গীর মত নিজের সম্বন্ধটাও যে অমন নিরর্থক, সে ভেবে দেখে নি। অসুস্থ অবনী আজো তার কাছে সমান সত্যি।

সঙ্গী বললে, ইচ্ছে না করলেও তবু আসতে হবে—দেখে যেতে হবে, খবর নিতে হবে। কেন?

মাধবী চমকে ওঠে। এমন একটা হৃদয়হীনকে কি বলবে, সে ভেবে পায় না। এখনই তার সঙ্গ ত্যাগ করাই যেন উচিত। এমন একটা লোকের সঙ্গে এমন নিদারুণ সঙ্কটে কেউ মিতালী করে, পাশে বসে বন্ধুতা করে, ছি! সেদিনের সেই বাহুবেষ্টনের স্পর্শ হঠাৎ সমস্ত দেহটাকে অগ্নিশলাকার মত বিদ্ধ করে। মুখ-খোলা ফোসকার মত জ্বালা করে সারা অঙ্গ মাধবীর। তবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই উনি তার দুঃখের সাথী হয়েছেন? না না, আর প্রশ্রয় দেবে না ওকে। সেদিনের পরে ওকে আবার বিশ্বাস করা উচিত হয় নি মাধবীর। ভাল-মন্দ কিছু ঘটলে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে কি তার? এই মৃত্যুর পটভূমিতে তাকে যদি লুট করে নেয় ও কোনদিন!

কয়েকদিন পরে ফিমেল ওয়ার্ডের পেসেণ্ট মীরার ঘরে ফেরবার খবর জানা গেল। এদিকে নিঝুম মেল-ওয়ার্ডে বসে মাধবী বুঝতে পারে, দেখতে পায়, মীরার বাড়ি ফেরার আয়োজন—খুশীতে যেন ডগমগ করছে মেয়েটা—সাজগোজের ঘটাও বেড়েছে আজকাল। ঘর-বার করাটাও সেই সঙ্গে। যতক্ষণ মাধবী দেখতে পায়, সুস্থির হয়ে মীরা এক জায়গায় বসে থাকে না। হঠাৎ মুক্তি-পাওয়া বিহঙ্গের মত খাঁচার বাইরে এসে উদ্‌ভ্রান্তের মত ভুলে যাওয়া পক্ষবিধূনন আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে। সঙ্গী ছেলেটি আজ কয়েকদিন হাসপাতালে আসছে না—তাতে কি, মীরার স্ফূর্তি অদমনীয়। ক'দিন পরে তো আসবার আর দরকারই করবে না—যখন খুশী, যেমন খুশী দুজনে মেলামেশা, হাসি-আমোদ করবে। ওদের বিয়ের কথাটা ভেবে মাধবী রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দেয়।

জানালার ভেতরে কেবিনে রোগশয্যায় অবনীর দেহটা অসাড়, নিষ্প্রভ, চোখ দুটো কেবল মাধবীর মুখের দিকে বাড়ান। মাধবী ওদিকে চেয়ে কি দেখছে?

মুখ ফিরিয়ে মাধবী জিগ্যেস্ করলে, আজ কেমন আছ?

অবনী ক্লান্তস্বরে জবাব দিলে, ভাল।

যেন অনেকদূর থেকে মাধবী জিগ্যেস করছে, আর জ্বর-টর হয় নি তো? প্লেট নেওয়া হয়েছে?

মধ্যবর্তী জানালার কাঠের গরাদে বোধ হয় অবনীর জবাবটা আটকে যায়, কিছুই শোনা যায় ন।

মাধবী আবার প্রশ্ন করে, জ্বর হয় না তো?

অবনীর উত্তরটা এবার বিরূপ শোনায়ঃ কি জানি!

মাধবী আর প্রশ্ন করতে সাহস করে না। হয়তো তারি দোষ—রোগীকে বিরক্ত করা তার উচিত হয় নি।

ঐ তো কেবিনের পার্টিসনের গায়ে জ্বরের চার্ট ঝোলান আছে। অত যদি আগ্রহ, ভেতরে এসে দেখতে পারে—কোন মানে হয় না অমন দূর থেকে খবর নেওয়ার। যেন ভেতরের কথা ভেবেই ভেতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না মাধবী। একটা অপরাধ বোধে অস্থির মনে মাধবী অপেক্ষা করে। কাঠের গরাদের ছায়ায় অবনীর নির্নিমেষ চোখ দুটো কেমন অমানুষিক দেখায়। মাধবী মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবনীর চাহনিকে তার বড় ভয় করে।

ওদিকে ফিমেল ওয়ার্ডে এখনো পুরুষ ভিজিটারটি আসে নি। বাইরে দুখানা চেয়ারের একখানা খালি। মীরা ঘাড় গুঁজে কি বুনছে—বোধ হয় আসছে শীতের জন্যে প্রণয়ীর সোয়েটার। কি অভিনিবেশসহকারে বোনার কাজটা ও করছে। যেন আজ-কালের মধ্যে কাজটা শেষ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে। অজান্তে মাধবীর বুক দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে, বিকেলের পড়ন্ত রোদের মত তাপহীন, জ্বলন্ত সে শ্বাস।

ভেতর থেকে অবনী অস্ফুটে বললে—এদিকে শুনবে, একটা কথা—

চকিত মাধবী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ধরা-গলায় বললে কিছু বলবে?—বল না!

অবনী বললে, তুমি আর এখানে এস না। মিছিমিছি কেন আর কষ্ট করবে।

মাধবী চুপ করে থাকে, একথার কি উত্তর দেবে সে ভেবে পায় না। অবনীকে আশ্বাস দেবার কথাটাও সে ভুলে যায়। যেন সত্যিই তার আর না আসাই উচিত এখানে এই রোগ-রাজ্যে। তার মনের কথাটাই অবনী বলে ফেলেছে।

হাঁপ নিয়ে অবনী বললে, তাছাড়া জায়গাটাও ভাল নয়—বলা যায় না, কখন কার কি হয়। রাগ করো না, তোমার ভালর জন্যেই বলচি। ভেবে দেখো, একটা মৃত্যুপথযাত্রীর জন্যে নিজের মন্দ ডেকে আনা উচিত নয়।

মাধবীর চোখ দুটো বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। অবনীকে থামাবার কোন ভাষা সে খুঁজে পায় না। সামনেটা ঘষা কাচের মত ধোঁয়াটে হয়ে যায়। অবনীর মুখটা অস্পষ্ট, তেড়াবেঁকা দেখায়। জানালার গরাদগুলো কালসিটে দাগের মত দাগড়া-দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে।

ভৌতিক কণ্ঠস্বরের মত অবনীর কথা শোনায়ঃ আমি তো মরেই গেচি। আমার জন্যে তুমি কেন মরতে যাবে? না না, এখানে তুমি আর এসো না, আমার অনুরোধ, আর এস না।

চুপ করে শুনে মাধবী নিঃশব্দে কাঁদে। সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারে না অবনীর নির্দেশ। এ শুধু অনুরোধ না, নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানঃ এতদিন পরে অবনীর মুখে ওকথা শোনবার জন্যে কি এত ধৈর্য ধরে আছে সে? ঘরে ঢোকবার হুকুম নেই, দেখতে আসবার সুযোগটাও অবনী কেড়ে নিচ্ছে? কিন্তু কেন? এ অবনীর অভিমান না, একান্ত আপনার জনের প্রতি অনুগ্রহ?

কিছুক্ষণ পরে অবনী জিগ্যেস করলে, আমার অনুরোধ রাখবে? কথা দাও।

চোখ মুছতে মুছতে মাধবী বললে, রাখবো,—তুমি ভেবো না। মিথ্যে ভয় করো না।

স্তিমিত চোখে খুশীর আভাষ দেখা গেল। অবনী বললে, না, আর আমার ভয় নেই।......

সোজা গেটে না এসে মাধবী হাসপাতালের অফিসে এল। অফিস তখন প্রায় বন্ধ। একজন প্রৌঢ় কেবল ওপরওয়ালার নজরে পড়বার বৃথা চেষ্টায় আসর জাগিয়ে বসে আছেন।

হঠাৎ এ সময় মাধবীকে দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। বোধ হয় ভাবলেন, হাসপাতালের নবনিযুক্তা কোন গণ্যমান্য লেডী ডাক্তার কি নার্স। ভদ্রলোক দেখিয়ে দেখিয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্যের অভিনয় করলেন।

মিনিট কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মাধবী নীচু গলায় বললেন, দয়া করে একটা খবর দিতে পারবেন?

ভদ্রলোকের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। মুখ তুলে আপাদমস্তক মাধবীকে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক নির্ভয়ে বললেন, এখন তো অফিস বন্ধ হয়ে গেচে।

মাধবী অনুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তবু যদি দয়া করেন একবার।

ভদ্রলোক অফিসিয়ল কণ্ঠে বললেন, আজ হবে না, কাল আসবেন। এখন অফিস বন্ধ, কোথায় খবর খুঁজতে যাই এখন আপনার জন্যে।

মাধবী আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালে—বোধ হয় ইতস্তত করলে খানিকটা।

পিছন থেকে ভদ্রলোক বিরক্তির সংগে বললেন, কই আসুন, কি খবর চান? কথা বললে আপনারা বোঝেন না।

মাধবী উত্তর না দিয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। থাক্, কি হবে খবর নিয়ে। আর কার খবর সে নেবে? গেটের কাছে এসে মাধবী অবাক হয়ে গেল, হাসপাতাল অফিসে কি ভেবে সে মীরার খবর নিতে গিয়েছিল? মীরার বাড়ি ফেরা নিয়ে তার অত মাথা ব্যথা কেন? মীরার পুরো নাম-ধামটাও সে জানে না। কোন মানে হয় না, এ অহেতুক কৌতূহলের। আর কি খবর সে জানতে চায় এখন মীরার সম্বন্ধে—মীরা কে? কোথায় বাড়ি? তার গার্জেন কে? ঠিক কবে ফিরে যাচ্ছে? এতে তার লাভ কি? ছি, ছি, বড় অশোভনীয় কৌতূহল তার। মীরা রোগমুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে ব'লে কি মাধবীর হিংসে হচ্ছে? মীরার সুখ সে সহ্য করতে পারছে না? নিজের কাছে মীরা বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে মাধবী চেয়ে দেখে, তার সম্বিত ফিরে আসে। হাসপাতালের সঙ্গী অভ্যর্থনা করে, আসুন না একসংগে ফেরা যাক। ছ'টা দশের ট্রেন এখনো ধরতে পারা যাবে।

কেন জানি না, মাধবী না করতে পারে না, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে একান্ত বাধ্যের মত সঙ্গীর সাহায্যে রিক্সায় উঠে বসে।

যেন এতক্ষণ সংগীর জন্যেই সে হাসপাতালের এখানে-ওখানে অপেক্ষা করছিল।

মাঝ-রাস্তায় এসে মাধবী জড়িত কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, আপনার আত্মীয়া কবে ছাড়া পাচ্ছেন?

অন্যমনস্কের মত সংগী জবাব দিলে, আসচে রোব্‌বার। সার্টিফিকেটের জন্যে দেরী হচ্ছে।

আর কোন কথা হয় না খানিকটা পথ দুজনের মধ্যে। ধড়ফড় করে রিক্সাটা এগিয়ে চলে। শীতের শুরুর কুয়াশার আস্তরণ গাছপালার আগায় বেধে গেছে, যেন উত্তাপে আকাশের খানিকটা উপছে উঠে মাটিতে নেমে এসেছে।

গায়ে গা লাগার স্পর্শটা ভুলতে যেন মাধবী অবান্তর প্রশ্ন করে, উনি আপনার কি রকম আত্মীয়া হন?

সংগীর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, বোধ হয় কথাটা তার কানেই যায় নি। আশপাশের বন থেকে ঝিঁঝিঁর ডাকটা বিকট শোনাচ্ছে, আকাশের গায় তারাগুলো জড়াজড়ি করে আছে।

মাধবী আবার প্রশ্ন করলে সাগ্রহেঃ আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বুঝি! কদ্দিন এখানে ছিলেন?

সংগী আপন স্পর্শটা আরো ঘনীভূত করে মাধবীকে নিস্পিষ্ট করে বললে, হ্যাঁ, তোমার মতই ঘনিষ্ঠ।

আশ্চর্য! না মাধবী করলে কোন প্রতিবাদ, না নিজেকে মুক্ত করবার কোন চেষ্টা। একান্ত অনুগতার মত নিজেকে সংগীর উদগ্র আকর্ষণের মধ্যে ছেড়ে দিলে। কোন লজ্জা, কোন আশংকা, কোন ভয় মাধবীর আর রইল না। মজ্জায় মজ্জায় সংগী-দেহের বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গিয়ে মাধবীর সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে দিলে। চোখ বুজিয়ে সংগীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কি যেন এক ভুলে-যাওয়া আঘ্রাণে মাধবী বিভোর হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে এখন পুরুষ-দেহের এই আঘ্রাত গন্ধটাই বোধ হয় সবচেয়ে সত্যি মাধবীর জন্যে।

পরের রবিবার দু'জনে একসংগে এক-গাড়ি থেকে কাঁচড়াপাড়ায় নামল। আজ এখান থেকেই ছাড়াছাড়ি হবার কথা। এবার যে যার রিক্‌সা করতে হবে। এক রিক্‌সায় যাওয়া সম্ভব হলেও এক রিক্‌সায় ফেরা আর চলবে না—মীরার আজ ঘরে ফেরবার কথা। সংগী যে রিক্‌সায় যাবে, সে রিক্‌সায় মীরাকে সংগে নিয়ে ফিরবে, কিন্তু মাধবীর রিক্‌সা আজ থেকে একলা মাধবীকে নিয়েই ফিরবে।

মনে হলো, দুজনের মনেই এ সমস্যার কথাটা জেগেছে। গাড়ি থেকে নামা থেকেই এর একটা সমাধান চিন্তা উভয়ের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। একসংগে গিয়ে তো আর একসংগে ফেরা যাবে না। তবুও একটা অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা উভয়কে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।

মাধবী গুটি গুটি এগিয়ে রিক্‌সা-স্ট্যান্ডের দিকে যায়। সংগীটি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে। আর মাধবীকে একসংগে ডাকবার তার মনের জোর বোধ হয় নেই। একটা অপ্রস্তুত মনোভাব নিয়ে সংগীটি নির্বোধ কৌতূহলে মাধবীর গতিপথ লক্ষ্য করে। যেন এই নতুন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে এসেছে সে।

মাধবী ওঠবার আগেই সংগীটি হঠাৎ ছুটে এসে রিক্‌সায় উঠে বসল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, উঠে আসুন।

মাধবী কিন্তু কিন্তু করলে। সংগী ডাক দিলে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, উঠে পড়ুন!

তবু মাধবী কথা বলে না। নির্বাক বিস্ময়ে সংগীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে। সংগী তাড়া দেয়, কি, আজ যাবেন না?

মাধবীর পা দুটো কাঁপল, ঠোঁটটা নড়ল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে সংগীর পাশে নীরবে বসল।

রিক্‌সা ছাড়তে সংগী মুখ বাড়িয়ে পাশের একখানা অপেক্ষমান রিক্‌সাকে চেঁচিয়ে বললে, তুমি ঘণ্টা দুই পরে কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে এসো। যাবার-আসবার পুরো ভাড়াই পাবে। গেটে সওয়ারী অপেক্ষা করবে।

সংগীর প্রশ্নটা মাধবীর কানে বাজছে, 'কি, আজ যাবেন না?' সত্যি যেন এ পথে আর আসা-যাওয়া করবার ইচ্ছে নেই মাধবীর, কি হবে শুধু স্মৃতির আবর্তে ঘুরে। অনেক সহ্য করেছে মাধবী, আর সে সহ্য করতে পারছে না—আর দুঃখ নয়, বেদনা নয়, এখন একেবারে সে মুক্তি চায়। যদি জিগ্যেস কর 'কি মুক্তি? 'কার থেকে মুক্তি', মাধবী স্পষ্ট করে বলতে পারবে না। শুধু সে মুক্তি চায়, নতুন করে বাঁচতে, আবার আনন্দের নিঃশ্বেস নিতে। ভুলে গিয়েও যদি এখন বাঁচা যায়। সংগীর অংগ স্পর্শে বার বার মাধবী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। এক চোখে কাঁদা, আর এক

চোখে হাসার মত তার আজ মনের অবস্থা। হয়তো এতদিনে পাশের লোকটিকে সে নিজের বলে মনে করেছে। আজ বাদে কাল আর দেখা-শোনার কোন সুযোগ হবে না। এই স্পর্শ বিচ্ছেদে তীব্র হয়ে উঠবে। তাকে শুধু অপরাধীই করবে। কে জানে এর পর আর নিয়মিত হাসপাতালে অবনীকে দেখতে আসা সম্ভব হবে কি না।

দুজনেই চুপ। সংকোচটা যেন দুরতিক্রম্য। জোর করে একগাড়িতে ওঠার জন্যে সঙ্গীটির সংকোচই যেন বেশী। মুখখোলা রিক্সায় খোলা রোদ্দুরে সঙ্গীটির মুখ যেন ঝলসে গেছে। মাধবী সামনেটা দেখতে পাচ্ছে না। ঝিলিমিলি রোদে খাঁ-খাঁ রাস্তাটা কিলবিল করছে, ঠায় চেয়ে থাকলে মনে হয়, মাটি সরে সরে যাচ্ছে।

সঙ্গী নীচু সুরে জিগ্যেস করলে, কি, খুব রাগ হলো? মাধবী অন্যমনস্কের মত বললে, কেন?

এই একসঙ্গে এলুম বলে! অপরাধ স্বীকারের মত সঙ্গী বললে।

না, রাগ হতে যাবে কেন। হঠাৎ বড় সপ্রতিভ শোনাল মাধবীর গলা।

তার পরের প্রশ্নটা উভয়েই এড়িয়ে চুপ করে থাকে, রিক্সা যথাগতিতে এগিয়ে চলে।

খানিকক্ষণ পরে সঙ্গী নিজে নিজে বলে, এবার বেশ একলা একলা আসবে। আর পথেঘাটে কেউ বিরক্ত করবে না।

মাধবী উত্তর করলে না। সঙ্গী অবাক হয়ে দেখলে মাধবীর দুচোখে জল।

সঙ্গী ব্যস্ত হয়ে বলে, একি কাঁদচো তুমি!

মাধবী শান্তকণ্ঠে বললে, না।

সত্যিই তো, এতে শুধু শুধু কাঁদবার কি আছে? সঙ্গী সান্ত্বনা দেবার লোভ সংবরণ করে।

যথারীতি রিক্সাটা ঘুরে সোজা হাসপাতালের রাস্তায় পড়তেই হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত মাধবীর কণ্ঠস্বর লাফিয়ে ওঠেঃ ওদিকে নয়, ওদিকে নয়! সিধে চল সামনে।

রিক্সাটা থেমে গেল ভ্যাবাচাকা খেয়ে। মাধবী তখনো রুদ্ধশ্বাসে বলছে, থামলে কেন? ঘুরিয়ে নাও—সামনে চল।

সঙ্গী ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে, কোথায়?

পাগলের মত মাধবী বললে, যেখানে খুশী। চাঁদমারী।

কিন্তু এরা? বিস্মিত কণ্ঠে সঙ্গী জিগ্যেস করলে।

উন্মত্তের মত মাধবী বললে, ওরা মরুক, মরুক, মরুক! আমরা পালাই চল শীগ্‌গীর......চালাও না, থামলে কেন?

সঙ্গীর বিস্ময় কাটে না। বললে, কি বলচো এ সব!

মাধবীর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে এল, ঠিক বলচি......ওকে তুমি চালাতে বল...আমাকে সঙ্গে নাও।

সঙ্গীর বুকের ওপর ঢলে পড়ে মাধবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, আর পারি না... আমাকে তুমি আর কিছু জিগ্যেস করো না!

* * * * *

দুদিন পরে একা একা মাধবী হাসপাতালে এল। চোখ তুলে চেনা জায়গাটাকে দেখবার তার সাহস নেই—চোখ তুললেই যেন এখনি একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে, তার পরিচয় নিয়ে নানারকম সন্দেহ গুঞ্জন উঠবে। এই সেই মেয়ে, যে দুদিন আগেও একজন পরপুরুষের গলাগলি হয়ে পালাতে চেয়েছিল—প্রিয়তমকে জীর্ণ বাসের মত ত্যাগ করতে চেয়েছিল। বিশ্বাসঘাতিনী এই নারী। রোগে-শোকে বিপদে কোন কাজেই লাগে না। বড় ক্ষুদ্রচেতা, আত্মসুখী এই মেয়ে।

মাথা নীচু করে পা টিপে টিপে মাধবী এগিয়ে আসে। চেনা যায় না, এই সেই মাধবী। দুদিনেই কি মূর্তি হয়েছে!—কলা-বনে ঝড় বয়ে যাওয়ার মত অঙ্গের সমস্ত লাবণ্য ছিঁড়ে বীভৎস হয়ে গেছে; উস্কখুস্ক চুল, আলুথালু বেশ—চোখের কোলে কালিরেখা। অসংবদ্ধ দেহভার।

অবনীর কেবিনের সামনে পাতা চেয়ার দুটোয় এক পুরু ধুলো জমে আছে। জানালায় মাকড়সা জাল বিস্তার করেছে। টিনের চালে বাতাসের শব্দ হচ্ছে দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত। সবুজ ঘাসের ছায়ায় দিন মৃতপ্রায়। মাধবীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে—অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে। কেন এল সে? আর কি দেখতেই বা এল?

কেবিনের ভেতরটা অন্ধকার। প্রথমটা কিছু যেন দেখা যায় না। লোহার খাটের ওপর ঘুমন্ত দেহটা প'ড়ে আছে। রোগীর মাথার কাছে গোটান মশারীতে রাত্রির ছায়া। বিবর্ণ জল-ছাপ টিপয়ে, খালি কাচের গ্লাসে, শুকনো ফলের খোলায় পরিত্যক্ত অব্যবহার্য সরাইখানার ছবি।

মুহূর্তের জন্যে মাধবী থমকে দাঁড়াল। মনে পড়ল অনেকদিন এ ঘরে ঢোকে নি সে—বাইরে থেকে কথা বলে চলে গেছে। কেন? ভয়েই বোধ হয়। মৃত্যুকে, রোগকে তার বড় ভয় করেছিল। আজ ভয় করছে না তার?

পড়ি-কি-মরি করে মাধবী ঘরে ঢুকে অবনীর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। বহুদিনের স্তূপীকৃত পুষ্পার্ঘের মত মাধবীর দেহটা নিবেদিত। নীরব কান্নায় ফুলে ফুলে ব্যথিত কুসুম-স্তূপ কেঁপে উঠছে যেন।

অবনীর ঘুম ভাঙল। নিদ্রালস কণ্ঠে বললে, কে?

কোন সাড়া নেই। শব্দটার প্রতিধ্বনি হলো কেবল।

সজাগ কণ্ঠে অবনী বললে, কে? মাধবী?

কোন উত্তর নেই—মাধবী অবনীর পায়ের ওপর নিশব্দে মাথা ঘসছে কেবল।

ক্লান্তস্বরে অবনী বললে, আবার তুমি এলে? কথা রাখলে না মাধবী—তোমার ভয় নেই!

মাধবী মুখ গুঁজে কেঁদে কেঁদে বললে, আমায় তুমি ক্ষমা কর। আর কখনো এমন হবে না। বল আমায় ক্ষমা করলে?

কি ছেলেমানুষী করচো। উঠে পড়, ছি! কি হয়েচে কি তোমার আজ! ওঠ, ওঠ।

অনেকদূরে থেকে যেন শব্দটা হলো, না, না, বল, আমায় তুমি ক্ষমা করলে?

অবনী বিরক্তির সঙ্গে বললে, কি মুশকিল, কি পাগলামী হচ্ছে—উঠে বস।

মাধবী উঠে বসল। শুয়ে শুয়ে অবনী বললে, আমার গায়ের চাদরটা টেনে দাও না, বড় শীত করছে।

পরম-যত্নে নিপুণ সেবাপরায়ণতায় মাধবী অবনীর শায়িত রুগ্ন দেহটার ওপর পায়ের তলায় জড়-করা কম্বলটা টেনে দিলে।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি। বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে নি। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা কল্পনামাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এ বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

* * *

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি এক গাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রীতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতী পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছিনে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাশে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন, "উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কেউ পড়েছ?" বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারী গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল।'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে। এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তার চরিত্রবলের দরুণ এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্য-শৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত-স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন। *

বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতর মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্য বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুকে আর যে সামান্য দু'একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে যে শুধু সে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখনো বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু'একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কোটেসন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, এ্যাণ্ড্রুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম। এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বমৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

(ক্রমশ)

* নির্বাসিতের আত্মকথা—চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭০ এবং ১৭২।

ভবদুলাল

খুব বেশি দিনের কথা নয়। এক বাঙালী যুবক কোন কার্য উপলক্ষে বোম্বাই শহরে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য কি ছিল জানা নেই, তবে যুবক ছিল ধনীর সন্তান, সুপুরুষ, সুদর্শন ও সুসজ্জিত। কিছু পানাহারের উদ্দেশ্যে সেই যুবক একদিন সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের একটি আধুনিক হোটেলে গিয়েছিল। পানীয় ও খাদ্যের ফরমায়েস দিয়ে যুবক চুপচাপ বসে অর্কেস্ট্রার ঐক্যতান উপভোগ করছে, এমন সময়ে অদূরে একটি টেবলে আসন গ্রহণ করল এক অতীব সুন্দরী ও লাবণ্যবতী মহিলা। মহিলার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যদিও এক ক্ষণস্থায়ী চাপা গুঞ্জনের সৃষ্টি হল, আমাদের পরিচিত সেই যুবক কিন্তু অপলক নেত্রে বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই রূপসীর দিকে চেয়ে রইল। কখন আহার ও পানীয় দিয়ে গেছে তার খেয়ালও নেই, ভ্রূক্ষেপও নেই, সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেই মহিলার দিকে।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে! মহিলা কিছু পান করে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু যাবার আগে নীল রঙের একটি কাগজ ছোট্ট একটি দলা পাকিয়ে যুবকের টেবলে ফেলে দিয়ে গেলেন। যুবক সাগ্রহে কাগজটি কুড়িয়ে নিয়ে কি লেখা আছে পড়তে গেল, কিন্তু হায় যে-ভাষায় লিপি লিখিত, সে-ভাষা যুবকের কাছে অবোধ্য, কিন্তু মুখ তুলে মহিলাকে আর দেখা গেল না, বাইরেও না।

মনঃক্ষুন্ন হয়ে যুবক বাড়িতে ফিরে এল। জানা গেল, সেই লিপি ফরাসী ভাষায় লিখিত। যুবকের এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিল, তিনি ফরাসী ভাষা জানতেন। যুবক লিপিখানি সেই ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক সেই লিপিখানির দিকে একবার চেয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, লিপিখানি যুবকের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অপমান করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

নিতান্ত মনঃক্ষুন্ন হয়েই যুবক ফিরে এল, কিন্তু আশাভঙ্গ হল না। সে এক খাস ফরাসী মহিলার কাছে গিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিপিখানি পড়তে দিলে। সমস্ত কাহিনীটি শুনে মহিলারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল, কিন্তু লিপিটি পাঠ করে তিনি এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। রক্তাক্ত নয়নে যুবকের দিকে চেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। লিপিখানি আগেই তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, যাবার আগে ইচ্ছা করে জুতো দিয়ে সেটি মাড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

যুবক বড়ই মুষড়ে পড়ল, যাকেই সেই লিপি পড়তে দেওয়া হয়, সেই রাগান্বিত হয়ে ওঠে, অথচ সেই নারী ও লিপির রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। অবশেষে আর এক যুবকের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি ফরাসী ভাষা জানেন। আমাদের পরিচিত যুবকের কাছ থেকে সব শুনে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন এবং বললেন যে, তিনি সেই লিপির পাঠোদ্ধার করে দেবেন, কিন্তু কিছুতেই ক্রোধান্বিত হবেন না।

যুবক সাগ্রহে পকেটে হাত দিলে সেই কাগজখানি বার করবার জন্য, কিন্তু কোন পকেটে অথবা কোথাও সেই কাগজখানি আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * * * *

অনেক দিন আগের কথা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড প্রদেশে রেল লাইনের ওপর একটি ছোট সেতুকে কালো রং করা হবে। লোকজন আগেই রং, তেল, তুলি ইত্যাদি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে। কার্যস্থলে পৌঁছুবার কিছু পরে বড় রং-মিস্ত্রি রং তৈরি করে দিয়ে অন্য এক জায়গায় কাজে চলে গেল; যাবার আগে জানিয়ে গেল তিন ঘণ্টা পরে সে ঠিকাদারকে নিয়ে আসবে, ততক্ষণে যেন সেতুটি রং করা হয়ে যায়। এদিকে হল কি রং-মিস্ত্রী চলে যাবার মিনিট দশ পরে ধাক্কা লেগে রংয়ের বালতি উল্টে পড়ে গিয়ে সব রং নষ্ট হয়ে গেল। সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল, কারণ রং-মিস্ত্রী আর ঠিকাদার উভয়েই ছিল অত্যন্ত কড়া লোক। একজন প্রস্তাব করল পালিয়ে যাওয়া যাক, কিন্তু আর একজন হার স্বীকার করতে চাইল না। সে বলল; আমরা যে কোন সময়েই ত পালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এই কথা বলে সে বাকি মাল-মশলা দিয়ে রং তৈরি করে সেতুতে লাগিয়ে দিলে, চমৎকার কালো রং হল। যথাসময়ে রং-মিস্ত্রী আর ঠিকাদার এসে সেতু দেখে গেল।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হল না। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে, সেতুতে আর রং লাগাবার প্রয়োজন হয়নি, আজও সে সেই প্রথম দিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু আন্দাজে মিশিয়ে রং তৈরি করা হয়েছিল, তার ভাগ কারও জানা নেই বলে সে রং কেউ তৈরি করতে পারল না।

* * * * *

সিঙ্গাপুরের জাহাজঘাটায় একটি লোক ধরা পড়েছে। লোকটি চৈনিক, সে গুপ্ত-ভাবে সোনা পাচার করত। তাকে পরীক্ষা করবার সময় দেখা গেল যে, তার ওয়েস্ট-কোটে বাইশটি পকেট আছে। এক-একবারে কয়েক হাজার টাকার সোনা সে লুকিয়ে নিয়ে যেত।

কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ পরীক্ষার সময় একটি পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছিল, তার কোটে অবশ্য বাইশটি পকেট ছিল না, কিন্তু আটটি পকেট ছিল; তবে দুঃখের বিষয় যে, ছেলেটি ভুল করে ফিজিক্স পরীক্ষার দিন কেমিস্ট্রি বইয়ের টুকরো-টাকরা পকেটে ভরে রেখেছিল। জাতও গেল, পেটও ভরল না।

* * * * *

পরেশ বাবুকে আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন না, চিনলে গল্পটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন। পরেশ বাবু এক সওদাগরী অফিসের ডেসপ্যাচার, অর্থাৎ পিওন ও ডাক মারফৎ চিঠিপত্তর পাঠিয়ে থাকেন। এখন সেদিন পরেশ বাবুর হাতে দুখানি চিঠি এসেছে, একখানি যাবে বোম্বাই, আর একখানি যাবে লণ্ডন। পরেশ বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভুল করবার প্রবৃত্তিবশে বোম্বাইয়ের জন্য দেয় টিকিট বসালেন লণ্ডনের চিঠিতে, আর লণ্ডনের টিকিট বসালেন বোম্বাইয়ের চিঠিতে। কিন্তু পরেশ বাবুর পাশের ভদ্রলোক রায় মশায় যখন ভুলটা ধরে দিলেন, তখন পরেশ বাবু এক সময়ে চুপিসাড়ে চিঠি দুখানার ঠিকানা কেটে হাতে লিখে বদলাবদলি করে ডাকবাক্সে নিজেই ফেলে দিলেন পাছে ধরা পড়ে যান।

আর একবার পরেশ বাবু পোস্ট অফিসে নিজেই গেছেন রেজেস্টারি চিঠি লাগাতে। পোস্ট অফিসের ভদ্রলোক যখন বললেন যে, 'মশাই আপনার চিঠি ভারি হয়ে গেছে, আরও টিকিট বসাতে হবে', পরেশ বাবু জবাব দিলেন, 'চিঠিতো তাহলে আরও ভারি হয়ে যাবে।'

ভারত-শিল্প

বিমলকুমার দত্ত

(৩)

চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব

শুংগ ও কান্ববংশ

(১৮৫—৭৩ ও ৭২—২৯ খৃঃ পূঃ)

মৌর্যবংশের দশম ও শেষ নরপতি বৃহদ্রথ মৌর্যকে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত করাইয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুংগ ১৮৫ খৃঃ পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সুংগেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ সেকারণ সুংগ শক্তি প্রতিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পুষ্যমিত্র তাঁহার রাজত্বকালে দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাতঞ্জলী এইরূপ একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর একাধারে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন, কলিংগের চেতরাজগণ এবং পশ্চিমে গান্ধার ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে সিরিয়া ও ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকরাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিখ্যাত মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ এই বংশের সন্তান হইয়াও নাগসেন নামক জনৈক ধর্মাচার্যের নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট পুষ্যমিত্র যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজত্ব-সীমা পশ্চিমে জলন্ধর ও শিয়ালকোট এবং দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। কলিংগরাজ খরবেলের নিকট ১৬১ খৃঃ পূঃ তাঁহার পরাজয় ঘটে। তাঁহার পরবর্তী ৯ জন নৃপতির রাজত্ব-কালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। আনুমানিক ৭৩ খৃঃ পূঃ শুংগবংশের শেষ নরপতি তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক নিহত হন। বাসুদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কান্ববংশ নামে খ্যাত। এই বংশের চারিজন নৃপতি যথাক্রমে মাত্র ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে মথুরা ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ শকাধিকারে ছিল।

সুংগ ও কান্বসম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও এই যুগে বৌদ্ধশিল্প প্রসার স্রোত অব্যাহত ছিল। একাধারে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে ভারত ও
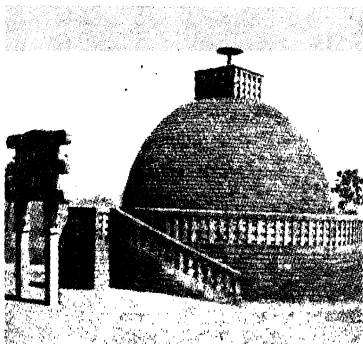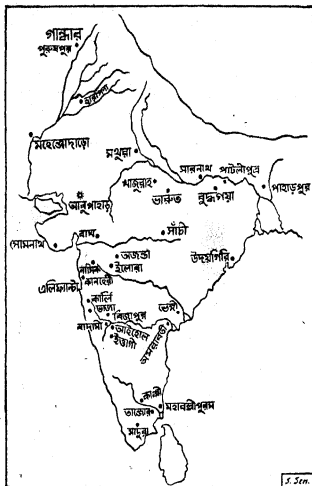
সাঁচী স্তূপ

সাঁচীস্তূপ এ যুগের সম্পূর্ণ শিল্প-নিদর্শন। তবে সাঁচীস্তূপগুলি এ যুগে সম্পূর্ণ হয় না কারণ ইহার তোরণদ্বার-গুলি পরবর্তী অন্ধ্রযুগে নির্মিত হয়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের রেলিংও এই সময়ে গঠিত।

কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যধারার সম্পূর্ণ অনুকরণে ভারুত, সাঁচী ও বুদ্ধগয়ার রেলিং ও তোরণদ্বারগুলি নির্মিত। উষ্ণীষ, বেদীকা ও সূচীগুলির যোগাযোগ পদ্ধতি পরিলক্ষণ করিলেই এ সত্য সহজেই অনুমেয়। কাঠের ন্যায় উভয় পার্শ্বের বেদীকার মধ্যে গর্ত করিয়া সূচিগুলি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। অনুরূপ-ভাবেও উষ্ণীষ ও বেদীকার যোগ সংরক্ষণ করা হইত। ভারুত চতুর্দিকস্থ চারিটি তোরণদ্বার মধ্যে পূর্বদিকেরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহাতে খোদিত আছে যে, ইহা শুঙ্গরাজত্বকালে নির্মিত। ভারত ও সাঁচীর এই তোরণদ্বার নির্মাণধারাটি

উদয়গিরি

ভারুত ভাস্কর্য

পরবর্তীকালে বৃহত্তর ভারতে এবং সুদূর চীন ও জাপানের স্থাপত্যে বিশেষ স্থানলাভ করে। জাপানের অনুরূপ তোরণদ্বার "তোরি" নামে খ্যাত এবং অধ্যুাপি প্রচলিত। সাঁচী ও ভারুতের রেলিং (বেদীকা) ও দ্বারগুলির বহু অংশ স্থানীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিগণের অর্থসাহায্যে গঠিত।

হাতীগুম্ফার (উড়িষ্যা) খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গাধিপতি খরবেল ১৬০ খৃঃ পূর্বাব্দে ইহা নির্মাণ করেন। মহারাজ খরবেল জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। উড়িষ্যার এই সকল প্রস্তরখোদিত জৈন আবাসগুলির মধ্যে রাণীগুম্ফা সর্বপ্রধান। রাণী ও গণেশগুম্ফার দুইটি দ্বিতলযুক্ত। এই গুম্ফা দুইটিতে প্রবেশ করিলেই প্রথমেই চতুষ্কোণ স্তম্ভযুক্ত বারান্দা পড়ে এবং বারান্দা অতিক্রম করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দরজাযুক্ত গৃহগুলির সম্মুখীন হওয়া যায়। এই গৃহ-গুলির প্রবেশপথের উপরিভাগে সারি-ভাবে জৈন কাহিনী সকল প্রস্তরগাত্রে রূপায়িত। উক্ত গুহাগুলির মধ্যে বাঘ-গুহাটি অদ্ভুত আকারের। একটি বিরাট ব্যাঘ্রের ব্যাদিত মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়া এই গুহাটির প্রবেশপথ সুন্দরভাবে খোদিত।

ভারুত স্তূপটি মূলত ইষ্টকনির্মিত কিন্তু বুদ্ধগয়া ও সাঁচীর ন্যায় ইহার বেদিকা (রেলিং) ও তোরণদ্বারগুলি প্রস্তর-

ভাজ চৈত্য

ইত্যাদি) সন্ধান পাওয়া যায়। কেবলমাত্র যে ইহারা আলঙ্কারিক চিহ্ন হিসাবে শিল্পীর অদ্ভুত পরিকল্পনা মাত্র তাহা নহে। সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার ফলকগুলিতে এবং তদানীন্তন-কালের পশ্চিম এশীয় শিল্পেও অনুরূপ অদ্ভুত চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং এগুলি যে কোন গূঢ় রহস্যাবৃত প্রাচীন শিল্পধারা যুগে যুগে ভারত শিল্পে স্থান পাইয়া আসিতেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।
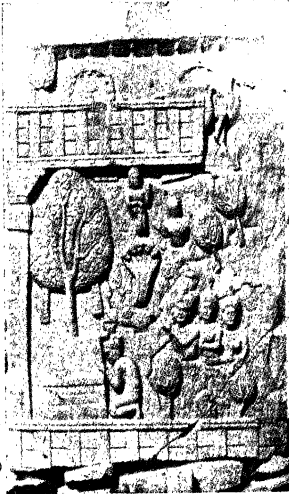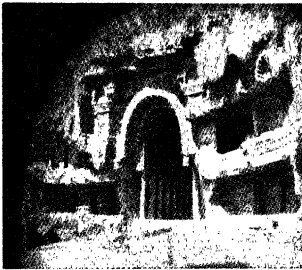
বুদ্ধমূর্তির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এ যুগের শিল্পের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। বৌদ্ধধর্ম সর্বদুঃখের মূলে যে "তৃষ্ণা" বা তৃষ্ণাকে আবিষ্কার করিয়াছিল, উহার পরি-বর্ধক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যবিলাস ও পার্থিব ভোগলালসা বিশেষভাবে নিন্দনীয় ছিল, এবং ফলে দেহকান্তিময় শিল্পকলা সাধনাও বর্জিত হইয়াছিল। কিন্তু এ যুগের নির্মিত। ভারুতস্তূপের বেদীকা ও তোরণ-দ্বারের অনেকাংশই কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত। ভারুতের বেদীকা ও তোরণগাত্রের লিপিসহ খোদিত যক্ষযক্ষী, নাগ ও দেবতা মূর্তি, জাতক কাহিনী ও বুদ্ধের জীবনী চিত্রাবলী এবং বিভিন্ন পশুপক্ষী, লতাপাতা ও ফলফুলের চিত্রগুলি এ যুগের শিল্পধারার প্রতীক। মনুষ্য, যক্ষযক্ষীর ও নাগ বা দেবতামূর্তি-গুলি সম্পূর্ণ সুন্দর ভাস্কর্যনিদর্শন না হইলেও পশুপক্ষীর খোদিত চিত্রগুলি শিল্পের নিখুঁততত্ত্ব ও সজীবতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ যুগের শিল্পে বুদ্ধ-মূর্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তবে প্রতীক চিহ্ন দ্বারা (যথা ছত্র, ত্রিরত্ন, সিংহাসন, চৈত্যবৃক্ষ, পাদুকা, ধর্মচক্র প্রভৃতি দ্বারা) বুদ্ধের জীবনী রূপায়িত হইয়াছে। ত্রিশূলাকৃতি ত্রিরত্ন চিহ্ন দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিনটিকে বুঝাইত। ভারুত ও সাঁচীর বেদীকা গাত্রে খোদিত জাতক কাহিনীগুলির মধ্যে ছদন্ত, অলম্বুজা, মহাকপি, শ্যামা, জেতবন প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দোহদমূর্তির (স্ত্রী বা বৃক্ষমূর্তি একত্রে) বহুল প্রচলন ও মিথুন মূর্তির (স্ত্রী ও পুরুষের সকাম আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি) প্রচলন এ যুগের শিল্পে দৃষ্ট হয়। ভারুত সাঁচী ও বৌদ্ধ-গয়ার বেদীকা গাত্রে কতকগুলি অদ্ভুত আকারের প্রাণীর (যথা মনুষ্যমুণ্ড বিশিষ্ট পশুমূর্তি, ডানা বিশিষ্ট মনুষ্যমূর্তি, এক মুণ্ডে যুক্ত দুইটি ও চারিটি পশুমূর্তি

সাঁচীর স্ত্রী মূর্তি

শিল্পে বোধিবৃক্ষ, বুদ্ধচরণ, ত্রিরত্ন প্রভৃতি ব্যঞ্জনায় এবং দেহকান্তিময় যক্ষযক্ষী, নাগ-দেবতা, দোহদ, মিথুন প্রভৃতি মূর্তি প্রকাশের মধ্যে উপরোক্ত কঠোর নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ভারুত শিল্পের কতকগুলি মূর্তির বেশভূষা দেখিলে পশ্চিম এশিয়া ও গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানদিগের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। মিহির নামক সূর্যদেবতার দণ্ডায়মান মূর্তিটির বেশভূষা যে সর্বতোভাবে অ-ভারতীয় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মৌর্য ও সুঙ্গযুগে পশ্চিম এশীয় ও গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানদিগের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক যোগাযোগই ইহার কারণ।

ভারুতের ভাস্কর্যে মূর্তিনিচয়ের পরি-প্রেক্ষিত রচনার অভাবে গভীরত্বহীনতা, কাল ও স্থানের অসঙ্গতি ও ভাবলেশহীন মুখাকৃতি ও মনুষ্যদেহের চ্যাপ্টাভাবের জন্য ইহা সাঁচীশিল্পের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না; তবে ইহারা আদিম সৌন্দর্য, সজীবতা ও সারল্যের জন্য খ্যাত।

বুদ্ধগয়ার বেদীকা কোন স্তূপের আবেষ্টনী নহে। ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব-লাভের পর গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া বোধি-বৃক্ষতলে পায়চারী করিয়াছিলেন। উক্ত পবিত্র স্থানটির স্মারকচিহ্ন ও রক্ষা উদ্দেশ্যে এই বেদীকা নির্মিত হয়। ভারুত ও সাঁচীর ন্যায় এখানেও নানাপ্রকার মনুষ্য ও পশুমূর্তি, জাতক কাহিনী, আলঙ্কারিক ও নির্দেশিক মূর্তি-চিহ্ন ও বৃক্ষলতার চিত্র খোদিত আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শাস্তির ও চতুরশ্বচালিত সূর্যমূর্তিটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা ও হস্তে পদ্মধৃতা একটি স্ত্রীমূর্তির মস্তকের উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটি হস্তী শুণ্ডে দ্বারা ধৃত পাত্র হইতে জল নিক্ষেপ করিতেছে—এইরূপ একটি মূর্তির প্রকাশ দেখা যায়। ইহা "গজলক্ষ্মী" মূর্তি নামে খ্যাত। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে এই মূর্তিটি পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীমূর্তি। শ্রী-"পদ্মস্থা পদ্মহস্তা গজোৎক্ষিপ্ত-ঘটপ্লুতা" আকারে প্রকাশিত। কিন্তু ডাঃ ফুসে প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের মতে ইহা গৌতম বুদ্ধের জন্মের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। যদিও এ যুগের বৌদ্ধশিল্পে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি রূপায়িত তথাপি তাহারা মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার পৌরাণিক লক্ষণ প্রকাশ দেখা যায় না। সাঁচী ও ভারুতেও উপরোক্ত গজলক্ষ্মীর বহুল প্রচলন দেখা যায়। বুদ্ধগয়ার শিল্পে ভারুত হইতে অধিকতর আড়ষ্টতাবিমুক্ত ও লাস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য শ্রেয়তর।

২নং সাঁচীস্তূপের বেদীকাগাত্রে খোদিত শিল্প যদিও এ যুগের তথাপি সাঁচী-শিল্পের অধিকতর বিকাশ (১ ও ২নং স্তূপের তোরণগাত্রস্থ শিল্পপ্রকাশ) অন্ধ্র-যুগের, সেকারণ উক্ত কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে। পাটনায় আবিষ্কৃত নন্দী ও বর্ধন নামক যক্ষমূর্তিদ্বয় এ যুগের শিল্পনিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামক পর্বতগাত্রে খোদিত হাতী, অনন্ত, রাণী ও গণেশগুম্ফা প্রভৃতি জৈনরাজ খরবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। রাণী ও গণেশ-গুম্ফার খোদিত ভাস্কর্যনিদর্শনগুলি জৈনকাহিনীগুলিকে একাধারে প্রস্তরগাত্রে সবল ও সচলরূপে দান করিয়াছে। এই স্থানের সবল শিল্পপ্রকাশের ভাব উড়িষ্যা-শিল্পের একান্ত নিজস্বতা। আজিও উক্ত জৈন কাহিনীগুলির বিষয়বস্তুর সঠিক বিবরণ জানা যায় না। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে উক্ত শিল্পের একটি বিশিষ্টাংশের অনুকরণ সযত্নে রক্ষিত আছে।

যদিও কোনপ্রকার চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না তথাপি তদানীন্তন জাতক (উম্মগ), বিনয়পিটক, মহাবংশ ও পাতঞ্জলী প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রিত রাজগৃহের ও চিত্র-শিল্পের নানাপ্রকার উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, এ যুগেও চিত্রশিল্পের বহুল প্রচলন ছিল। (ক্রমশঃ)

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(সোয়েডেনের কথা)

পেন্‌শানেটে পৌঁছতে রাত্রি ন'টা হ'ল। স্টেশান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ট্যাক্সী ভাড়া নিলে সাড়ে তিন ক্রোন। সোয়েডেনের টাকাকেও ডেনমার্কের মতো ক্রোন বলে। একই তো রাজ্য ছিল একদিন। তবে ড্যানিশ ক্রোনের চেয়ে সুইডিশ ক্রোনের দাম বেশী। এক শিলিং পাঁচ পেন্স। একটি দিনেমার ক্রোনের দাম মাত্র এক শিলিঙ পেনশানেটটির নাম 'ফ্রেডরিকশোভেন পেনশানেট'। বড় রাস্তার উপর ভাল একখানি বাড়ি। একজন ইতালীয় যুবক ও তাঁর সুইডিশ পত্নী এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। পরে জানা গিয়েছিল, স্বত্বাধিকারী এই সুইডিশ মেয়েটিই। ইতালীয় তরুণটি কোনও ভাগ্যান্বেষী ভাগ্যবান। এসেছিলেন একদিন এ বাড়ির রাঁধুনী হ'য়ে। কিন্তু নিজ গুণে মনিবানীর মনোজয় ক'রে কালক্রমে তাঁর হৃদয় ও বিষয়েরও মালিক হ'য়ে উঠেছেন। সদাহাস্যময় সুরসিক প্রিয়দর্শন যুবক। কোঁকড়া কালো মাথার চুল, ভ্রমর কালো দুটি চোখের তারা। ছোকরাটিকে কন্দর্পকান্তি বলা যেতে পারে। অপরিমিত প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। চমৎকার ইংরাজী বলেন। নাম তাঁর ফ্রেডরিক। টেলিফোনে খবর পেয়ে এঁ'রা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। বহুদিন পরে দূর বিদেশ থেকে কোনও পরমাত্মীয় ঘরে ফিরে এলে তাকে যেমন পরিবারের সকলে মিলে মহাসমাদরে গ্রহণ করে তেমনি ক'রেই এঁ'রা আমাদের আনন্দমুখর-অভ্যর্থনা জানালেন।

একটু ইতস্ততঃ করে ট্রেন লেটের কৈফিয়ৎ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ডিনার টাইম তো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আপনাদের এখানে বোধ হয় এখন আর কিছুই খেতে পাওয়া যাবে না? ফ্রেডরিক বললেন—নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ফ্রেডরিক তার কোনও অতিথিকে অনাহারে থাকতে দেবে না। অর্ধ রাত্রেও এখানে ডিনার পাবেন। বলুন আপনারা কি খাবেন? পিল্লাউ? কুতুলেৎ? আমি সব রকম ইণ্ডিয়ান ডিশ রাঁধতে জানি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই তৈরি করে এনে দেবো। একেবারে টাটকা গরম!' হোটেলকর্ত্রী হেসে বললেন 'ফ্রেডরিকের রান্না এত সুস্বাদু যে রসনা তার আস্বাদ কোনওদিনই ভুলতে পারে না। শ্রীমতী বললেন, ও দুটো কাল মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অর্ডার দেওয়া রইল। আজ রাত হয়ে গেছে। তিনটে রাইস কারী পেলেই খুশী হবো।

ফ্রেডরিক 'ও-কে'! বলে চলে যাবার আগে বলে গেল 'আপনারা হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হ'য়ে এক এক গ্লাশ ঠাণ্ডা সর্বৎ খান। পিপাসা পেয়েছে নিশ্চয়! আমার স্ত্রী ভারি চমৎকার 'ইণ্ডিয়ান ড্রিংকস্' তৈরি করতে পারেন কাশ্মীরী সর্বৎ! চেখে তারিফ করতে হবে।

বেরিয়ে গেলেন ওঁরা দু'জনেই। বড় ভাল লাগলো দূর বিদেশে এই রকম আত্মীয়বৎ এক দম্পতিকে। বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘর-খানা ছেড়ে দিয়েছেন দেখলাম আমাদের জন্য। দ্বিতলের উপর রাস্তার দিকে সুসজ্জিত এই শয়ন ঘর। সামনের দালানে বৈঠকের জন্য ড্রয়িংরুম সাজানো। সেখানে ইতালীয় পুতুল, পোর্সিলেন ও ছবিই বেশি। দেখে মনে হল এগুলি সম্ভবতঃ তাঁর সুইডিশ প্রিয়াকে ফ্রেডরিকের প্রীতি উপহার।

সর্বৎ এল। সর্বৎ কিন্তু সেটি নয়। সুশীতল লেমন স্কোয়াশ। ফ্রেডরিক-পত্নীকে হেসে বললাম 'আপনি আমাদের ফাঁকি দিলেন কিন্তু! আপনার স্বামীর মুখে প্রশংসা শুনে আপনার হাতের তৈরি ভারতীয় সর্বতের আস্বাদ পাবার জন্য তৃষিত চাতকের মতো অপেক্ষা করছিলাম।' তিনি একটু লজ্জিত হয়ে বললেন 'আমার স্বামীর কথা আপনারা একটুও বিশ্বাস করবেন না। ও আমার কথা সকলের কাছেই বেজায় বাড়িয়ে বলে। ওর ধারণায় বা কল্পনায় যে আমি, সে সত্যকার আমির চেয়ে অনেক সুন্দর আর সর্বগুণান্বিত!'

আমার পত্নী বললেন, 'আপনার সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হচ্ছে! আমার স্বামী কিন্তু কারুর কাছেই আমার প্রশংসা করেন না।
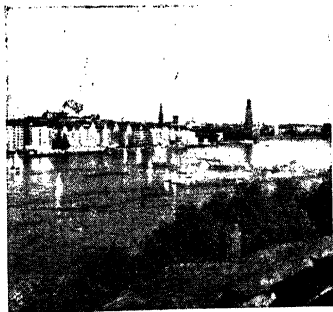
ম্যালার্ন লেকের তীরে স্টকহোম শহর

ও'র ধারণার 'আমি' সত্যকার 'আমি'র চেয়ে একটুও বড় নয়!'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'উনি যে আমার চেয়ে অনেক বড় কবি একথা আমি সকলের কাছে অকপটে স্বীকার করি।'

শ্রীমতী ফ্রেডরিক বললেন, 'আপনার ধারণার সত্যে ও বাস্তব সত্যে এখানে তফাৎ কিছু নাও থাকতে পারে তো?'

দুটি মিহি গলায় খুব একটা হাসির রোল উঠলো! আমার কণ্ঠের খাদে সুর হয়ত তার মধ্যে বেসুরোর মতই বাজলো।

শ্রীমতী ফ্রেডরিক বললেন, 'সর্বৎই ক'রে আনতে গেছলাম, কিন্তু গিয়ে দেখি ভাঁড়ারে তার সরঞ্জাম নেই। দোকানও সব এত রাত্রে বন্ধ। কাজেই আপনাদের আজ আর ভারতীয় সর্বতে পরিতৃপ্ত করতে পারলাম না। ক্ষমা করবেন। আর একদিন নিশ্চয় খাওয়াবো।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি বুঝি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন?' তিনি হেসে বললেন—'না, আমার একটি ভারতীয় বন্ধু আছেন। তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন। আমাদের এখানেই দীর্ঘকাল ছিলেন। সম্প্রতি অন্য বাসা নিয়েছেন। বিবাহ করবেন কিনা। তিনিও বাঙালী। ফ্রেডরিক তো তাঁর কাছেই সব ইণ্ডিয়ান ডিশ রাঁধতে শিখেছে। আপনারা যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান আমি টেলিফোনে খবর দিয়ে তাঁকে এখানে আনাতে পারি। অনেকদিন পরে দেশের লোক দেখে তিনি খুব খুশী হবেন নিশ্চয়। বুঝলাম সেই ভারতীয় অতিথিটির উপর ভদ্রমহিলার বেশ একটু প্রভাব আছে। থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কারণ ইনি বিদুষী এবং তরুণী। তার উপর মিষ্টহাসিনী ও মিষ্টভাষিণী। মানুষের হৃদয় জয় করবার সব ক'টি আয়ুধই এ'র সৃষ্টিকর্তা এ'কে দিয়েছেন।

খাবার এল। কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যে নয়। আধঘণ্টা পরে। আর রাইস কারি নয়। সেই 'পিল্লাউ'-কুতুলেৎ'! 'পিল্লাউ' বা পোলাও দেখা গেল হলুদ রংয়ের শক্ত ভাত মাত্র! ঘি-মাখনের নাম গন্ধ নেই। এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি তেজপাতা কিসমিস প্রভৃতি সকল আতিশয্য বর্জিত! আর 'কুতুলেৎ' হল 'ফাউল কাটলেট!' বললেন—'আমার বন্ধু ব্যানার্জির কাছে শুনেছি এটা তোমাদের প্রিয় খাদ্য!' কথাটা মিথ্যা নয়। ক্ষুধার মুখে ভালই লাগলো।

সব গুছিয়ে নিয়ে শুতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল! পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর স্টকহোম শহরটি দেখতে বেরুলাম। এবার এক্সকার্শান বাসে নয়, নিজেরাই শহরের ম্যাপ নিয়ে পায়দলে যতটা ঘুরতে পারি। কারণ আমরা চলেছি উত্তর মেরু প্রদেশে 'নিশীথরাতের সূর্য' দেখতে। সেখান থেকে নরওয়ের রাজধানী ওস্‌লো যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নার্ভিক থেকে 'ওস্‌লো' যাবার সরাসরি ট্রেন নেই। স্টকহোম থেকে 'ওস্‌লো' যাবার সরাসরি ট্রেন আছে। নার্ভিক থেকে যেতে হ'লে ট্রেন, স্টীমার,

স্টকহোম—টাউন হল

বাস, নৌকো, অনেক কিছু যানবাহনের সাহায্যে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে। অগত্যা 'নিশীথরাতের সূর্য' সন্দর্শনের পর এখানেই যখন ফিরতে হবে তখন সেই সময় ভাল ক'রে সোয়েডেনে বেড়িয়ে তারপর 'ওস্‌লো' যাবো স্থির হয়েছিল।

সোয়েডেনে নাকি ভারতীয়েরা আগে কদাচ কখনও পদার্পণ করতেন। কিছুদিন থেকে এখানে তাঁদের আসা-যাওয়া একটু বেড়েছে। সুইডিশরা বড় ভদ্র। বিদেশী অতিথিদের তাঁরা কত যে যত্ন করেন, সে পরিচয় তো আমরা ট্রেন থেকেই পেয়েছি। এ'দের প্রকৃতি কেমন যেন একটু সলজ্জ ধরণের। এ'রা য়ুরোপের ঠিক চৌমাথার মানুষ নন বলেই বোধ করি তেমন চৌকোষ চটপটে হ'য়ে ওঠেননি। উত্তরাখণ্ডের শান্ত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মতোই এদেশের মানুষগুলিও শান্ত সুন্দর। বিশাল মালার্ন হ্রদের তীরে বাল্টিক সমুদ্রের এক বিস্তৃত বাহুর উপর প্রতিষ্ঠিত এই দ্বীপ-সঙ্কুল সুন্দর শহরটি। স্টকহোম দেখে খুশী হওয়া গেল। যেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি সুসজ্জিত। বিশেষ করে এই শহরের পরিবেশটি আমাদের কাছে ভারি মনোরম মনে হল। সাগর বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে গিরি শৈলাশ্রিত দ্বীপ-মালার আবেষ্টনে এই সুদৃশ্য নগরটি গড়ে উঠেছে। দেশবাসীর সুকুমার শিল্প রুচি বোধের সঙ্গে তাঁদের হাতে বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক যাদুদণ্ডটি থাকায় তাঁরা স্টক-হোমকে একেবারে 'সুইটহোম' করে তুলেছেন।

প্রকৃতির হরিৎ শিবিরে যখন বসন্তের স্বর্ণ পতাকা প্রায় অবনমিত হয়ে এসেছে আমরা সেই মাধবী প্রদোষে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। তখনও কিন্তু সে কি আশ্চর্য রূপ সোয়েডেনের! দুটি চোখ ভরে উঠেছিল সে সৌন্দর্যের আনন্দ পরশে। সারাদিন কাল ট্রেনে দু' পাশের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে এসেছি, জানি না পৃথিবীর আর কোথাও প্রকৃতির এত বেশী ঐশ্বর্যের অফুরন্ত প্রকাশ দেখতে পাবো কিনা!

লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত মেনন আমাদের 'ইন্দো-সুইডিশ বান্ধব সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীযুক্ত স্টমগ্রেন সাহেবের পরিচয়পত্র দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার এবং সোয়েডেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত আর কে নেহরুর সঙ্গেও দেখা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গেলাম সকালবেলা সেদিন নেহরুজীর কাছেই আগে। নগরের শোভা উপভোগ করতে করতে এবং ইণ্ডিয়ান লিগেশানের ঠিকানাটা হাতে নিয়ে পথিকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে ৪৭নং 'স্ট্র্যাণ্ড ভেগেন' রোডে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। বেলা তখন দশটা বেজে গেছে। এ অঞ্চলটা স্টকহোমের একটা প্রসিদ্ধ অঞ্চল। প্রাসাদ তুল্য একটি বাড়িতে এই ভারতীয় লিগেশানের অফিস। সেখানে গিয়ে শোনা গেল এই ভারতীয় বাদশাহটি দরিদ্র ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থে এখানে দস্তুর মতো নবাবী করেন। স্টকহোমের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা ব্যয় সাধ্য যে যাত্রী নিবাস সেই প্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড-

রাজপ্রাসাদ—স্টকহোম
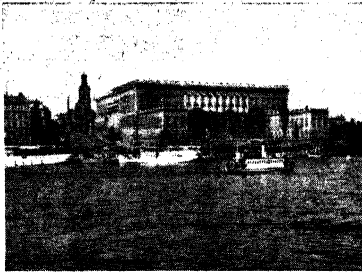
হোটেলের একটি ষোলো কামরা স্যুট নিয়ে তিনি মহারাজাধিরাজের মর্যাদায় মণ্ডিত হ'য়ে অধিষ্ঠিত। কোনো কোনোদিন অফিসে আসেন বেলা ১২টার পর। সর্বদিন পেরে ওঠেন না। এলে আধঘণ্টার বেশী থাকেন না। তাঁর সংগে দেখা করতে হলে গ্র্যান্ড হোটেলে যেতে হবে।

এ সব শুনে মেজাজ গেল চটে। যে কর্মচারীটি আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তাঁর হাতে আমাদের একখানা কার্ড বার ক'রে দিয়ে বলে এলাম আপনাদের বড় হুজুরকে এটি দেবেন আর আমাদের নাম করে বলবেন তাঁর কর্মস্থলের অফিসিয়াল ঠিকানা এইটে। আমরা তাঁকে এইখানেই পাবো আশা করেছিলাম। অফিস টাইমও বেলা দশটা থেকে। বারোটা থেকে নয়। গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর প্রাইভেট কোয়ার্টার। আমরা তাঁর আত্মীয় নই এবং তাঁর ফ্যামিলিকেও 'মিট' করতে আসিনি। সুতরাং সেখানে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করাটা রীতিসম্মত বলে মনে করি না। আমরা আবার কাল বেলা চারটের সময় আসবো। সে সময় তাঁকে অফিসেই দেখতে পেলে সুখী হবো। তিনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়ার তিনি একজন মোটা বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী মাত্র, তার বেশী কিছু নয়।

উঠে বেরিয়ে আসছিলাম। দিলেন না তাঁরা আসতে। অফিসের চার পাঁচজন কর্মচারী আমাদের ভিজিটারর্স রুম থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে সুসজ্জিত ও প্রশস্ত রিসেপশান রুমে এনে বসালেন। বললেন —লিগেশানের অধিকর্তার বিরুদ্ধে এ রকম কঠিন মন্তব্য ইতিপূর্বে আর কোনও ভিজিটার করেননি। গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে দেখা করবার অনুরোধ পেয়ে এ পর্যন্ত প্রায় সকলেই খুশি হয়েছেন। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর প্রাইভেট কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করতে বলায় আপত্তি করলেন। নিশ্চয়ই, দেশবাসীর সংগে দেখা করার স্থান তাঁর এইখানেই, এতো অতি সত্য। তবে একটা কথা আপনাকে বলা উচিত মনে করি যে, আপনি নেহরুজী সম্বন্ধে বড় ভুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অতি ভদ্র। পূর্বাহ্নে এনগেজমেণ্ট করলে তিনি সকলের সংগেই দেখা করেন।

কথায় কথায় আরও অনেক কথাই হল। যে চার পাঁচজন কর্মচারী ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের, দুই চোখে তাঁদের বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহল। পরিচয় হল তাঁদের সকলের সংগে। দুটি তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবী ছেলে। শ্রীযুক্ত ও পি খান্না ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নির্মল। এ'রা কিছুদিন থেকে সস্ত্রীক এখানে এসে রয়েছেন। আর একজন হ'লেন লিগেশানের সুইডিশ সাহেব কর্মচারী। কিন্তু দীর্ঘকাল নিরত ভারতীয় সহকর্মীদের সঙ্গ ও সাহচর্যের ফলে আপন স্বভাব ভ্রষ্ট হ'য়ে তিনি একেবারে ভারতীয় বনে গিয়েছেন। বড় ভাল মানুষ লোকটি। হিন্দী বাঙলা কিছু কিছু বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না ভাল। আর একটি প্রিয়-দর্শন ছেলের সংগে আলাপ হল। ইনি শ্রীমান বিমল মিত্র। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বাড়ি। বিবাহ করেননি। উদার মন ও সংস্বভাবের ছেলে।

তাঁরা বললেন, আপনাদের সব কথা হয়ত আমরা তাঁকে বলতে পারবো না, কেননা তিনি হলেন এখানে আমাদের প্রধান। তবে এটা ঠিক, আমরা তাকে এমন কিছু বলবো যাতে সর্বকার্য ফেলে তিনি কাল বেলা চারটেয় এখানে এসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেন।' বললাম, কাল আমরা আসতেও পারি, নাও আসতে পারি। আপনাদের তাঁকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না, শুধু বলবেন

নৃপতি দ্বাদশ কার্লের প্রতিমূর্তি—স্টকহোম

যে লণ্ডনের হাই-কমিশনার মেনন সাহেবের অনুরোধেই আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, কেবলমাত্র শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা বশতঃ। নইলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার আমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা ব্যবসায়ী নই এবং রাজনীতিজ্ঞও নই। কোনও রকম ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে এখানে আসিনি।'

ওঁরা আমাদের তিনজনকে চা কোকো আর অরেঞ্জ খাওয়ালেন। ভারতীয় এলাচ-লবঙ্গ সুপারি মশলাও খাওয়ালেন এবং আমাদের কাছ থেকেও নিয়ে খেলেন। শ্রীযুক্ত ওমপ্রকাশ একটু কাব্যরসিক। তিনি প্রায় আবুহোসেনের মতই বলে বসলেন, আজ রাত্রে আপনারা আমাদের ওখানেই নৈশ ভোজন করবেন। পাঞ্জাবী খাওয়া বাঙলা খাওয়ার চেয়ে খুব খারাপ নয়। বাড়িতে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন, তিনজন ভারতীয় অতিথি নিয়ে তিনি রাত্রে খাবেন। ছাড়লেন না কোন মতেই। খান্না ও নির্মল-ভাই এক সঙ্গে একটি বাসা নিয়ে আছেন বটে, কিন্তু বাড়িটিই এক, আর সবই আলাদা। বিমল অবিবাহিত। সে পৃথক কোয়ার্টারে থাকে। আর সাহেব কর্মচারীটি স্টকহোমের উপকণ্ঠে বাস করেন, ঠিক শহরের মধ্যে থাকেন না। ইলেকট্রিক ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন।

লিগেশান থেকে বেরিয়ে লাঞ্চের এখনও যথেষ্ট দেরী আছে দেখে আমরা গেলাম 'ইন্ডোসুইডিশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত স্ট্রমগ্রেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। ইন্ডিয়ান লিগেশানের ছেলেরা এঁর ঠিকানাটা আমাদের এমন ক'রে কাগজে এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের বেশী ঘুরতে হল না। সহজেই তাঁর ঠিকানা আবিষ্কার করা গেল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতেই শ্রীযুক্ত স্ট্রমগ্রেন সাহেব স্বয়ং দরজা খুলে আমাদের ত্রিমূর্তিকে দেখে বিস্মিত হ'লেন। কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মেনন সাহেবের পরিচয়পত্র পেশ করা গেল। মহাসমাদরে তিনি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। বার বার বলতে লাগলেন একটু খবর দিতে হয় আগে।' কাল রাত্রে এসেছেন বলছেন, কোথায় উঠেছেন? স্টকহোমে এখন খুব 'রাশ'। কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হ'চ্ছে না তো সেখানে?' ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—না, আমরা বেশ আরামে আছি।

ফ্রেডারিক সাহেব সস্ত্রীক আমাদের খুব যত্ন করছেন।

হ্যাঁ, যথার্থই ভারতবন্ধু বটে! আমাদের ঘরে একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্র নেই, কিন্তু এই সুদূর সোয়েডেন—য়ুরোপের উত্তরাখণ্ডের এক গোরা অধিবাসীর ঘরে ভারতের বিরাট এক মানচিত্র ঝুলচে। শুধু কি তাই? ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

'কুজ্ঝটিকা' ও 'সূর্যোপাসক'

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি ভারতীয় চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্র ও ধর্মগুরুগণের সুন্দর সুন্দর চিত্র বিলম্বিত। হিমালয় পর্বতের দৃশ্য, নর্মদা জলপ্রপাত, জব্বলপুরের মর্মর শৈলের ছবি, কাবেরীর বাঁধ ইত্যাদির আলোকচিত্র রয়েছে। স্ট্রমগ্রেন বললেন, সুইডেন আমার গর্ভধারিণী এবং ভারতবর্ষ আমার স্তন্য-দায়িনী ধাত্রীমাতা। এই ফটোগ্রাফগুলি তাঁর নিজের হাতের তোলা। তিনি দীর্ঘকাল মান্দ্রাজে ছিলেন—জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের কাজে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি একজন বিদ্যুৎবিশারদ ইঞ্জিনীয়ার। ভারতে এসে ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। আধাবয়সী মানুষটি, কিন্তু যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এতটুকুও ম্লান হয়নি। দেখতেও সুপুরুষ। ঘরের মধ্যে যে সব আসবাবপত্র রয়েছে তা' অধিকাংশই ভারতীয়। হাতীর দাঁত, চন্দনকাঠ, আবলুশ, মেহগিনী মায় হরিণের শিং, নারিকেল, সুপারি ও পেপার-মেশ্যিঁয়ে তৈরী নানা ভারতীয় শিল্প সামগ্রী সংগৃহীত রয়েছে। এ ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হ'ল যেন কোন এক ভারতবাসীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করেছি। ঠিক এমনি ভাল লেগেছিল আমাদের, লণ্ডনে শ্রীমতী এলা রীডের ড্রয়িংরুমে ঢুকে। তিনি সেখানে এমনই একটি স্নিগ্ধ সুন্দর শান্তি-নিকেতনী পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। অবশ্য শ্রীমতী এলা বাঙলাদেশের মেয়ে। তাঁর পক্ষে এমনটি করা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একজন ইয়োরোপীয়ের ঘরে এ ব্যাপার অপ্রত্যাশিত। বেশ একটু আনন্দ বোধ হল।

গল্প করতে করতে বেলা বাড়লো। এই সুইডিশ ভদ্রলোক কিছুকাল ভারতে থেকে ভারত সম্বন্ধে কত জ্ঞানই সঞ্চয় ক'রে এসেছেন। আমরা সে দেশে জন্মে এবং সারাজীবন সেখানে কাটিয়েও ভারত সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি না আজও। লজ্জানুভব হচ্ছিল। এই মাত্র ইণ্ডিয়ান লিগেশান থেকে আসছি শুনে তিনি বললেন, তাহ'লে স্টকহোমের কিছুই এখনো দেখা হয়নি বলুন? আমার সঙ্গে আজ আপনারা লাঞ্চ খাবেন, তারপর আপনাদের আমি শহর ঘুরিয়ে আনবো। আজ আপনাদের সম্মানের জন্য আমার অফিসের ছুটি!

নিজের মোটরে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে একটি সুন্দর রেস্তোঁরায় তিনজনকে বসালেন। বেছে বেছে ভাল সুইডিশ খাদ্য যা ভারতীয় রসনায় সুস্বাদু লাগতে পারে তাই অর্ডার দিলেন। খেতে খেতে গল্প হ'চ্ছিল। শ্রীযুক্ত আর কে নেহরুর কথা উঠলো। মিঃ স্ট্রমগ্রেন তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। ওই অফিস পালানো রোগ ছাড়া আর কোনও দোষ নেই ভদ্রলোকের। একটু আর্টিস্টিক টেম্পারামেণ্টের মানুষ কিনা, অফিশিয়াল রুটিনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠেন। 'হি ইজ এ প্রিন্স এ্যামঙ্ ইণ্ডিয়ান!' এই তো সেদিন সপরিবারে নরওয়ে থেকে 'মিড্‌নাইট সান' দেখে ফিরেছেন। স্পেশ্যাল ট্রেনে গেছলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।' আমরাও মিডনাইট সান

দেখতে যাবো শুনে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে আমাদের যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন।

খেয়ে উঠে আমরা স্ট্রমগ্রেন সাহেবের গাড়ীতেই তাঁর সঙ্গে শহর দেখতে বেরুলাম। গাড়ীতে উঠে তাঁকে বললাম—আমরা একবার সুইডিশ পি-ই-এন সেণ্টারের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কার্ল বোয়েরক্‌ম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। স্ট্রমগ্রেন বললেন—'চলুন নিয়ে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আলাপ আছে। কাছেই তাঁর অফিস। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে রেখেছেন কি? নইলে তো দেখা হবে না। তিনি ভারি কর্মব্যস্ত মানুষ। আমার মতো 'ইন্‌ফরম্যাল্' নন। স্ট্রমগ্রেন আমাদের নিয়ে নিজের অফিসে ফিরলেন। ফোন তুলে নিয়ে ডাঃ বোয়েরক্‌-ম্যানের সেক্রেটারীকে ডাকলেন। তাঁর এনগেজমেণ্ট বইটা দেখে জানাতে বললেন, তিনি এ সময় ফ্রী আছেন কিনা। ভারতবর্ষ থেকে একটি কবি দম্পতী এসেছেন। তাঁরা পেন ক্লাবের সদস্য। তিনি কি এখন একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন? সেক্রেটারী ডাঃ বোয়েরক্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানালেন—আসতে পারেন।

ডাঃ কার্ল বোয়েরক্‌ম্যান মানুষটিকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে আমাদের কেবলই শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়কে মনে পড়ছিল। যদিও চেহারায় উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যই। বোয়েরক্‌ম্যান বিরাট দেহ মানুষ। প্রকৃতিতে বাইরে থেকে মানুষটি বেশ গম্ভীর। খুব রাসভারি বলে মনে হয়। কিন্তু আলাপ করে ভারি খুশী ও তৃপ্ত হলেম। যেমন গভীর পণ্ডিত তেমনি অনবদ্য রসিক। আগে থেকে এন্‌গেজমেণ্ট ক'রে নাযাওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। কাল ও'র সঙ্গে লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বেল দিয়ে সেক্রেটারীকে ডেকে বলে দিলেন এ'দের তুমি নরওয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করে দাও। স্ট্রমগ্রেন সাহেব স্বয়ং সে ভার নিয়েছেন বলাতে পেনক্লাবের পক্ষ থেকে তিনি স্ট্রমগ্রেন সাহেবকে ধন্যবাদ জানালেন। নার্ভিক থেকে ফিরে এস ওস্‌লো যাবার আগে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করি বললেন। এডিনবরার এবারকার ইণ্টারন্যাশনাল পেন কংগ্রেসে যেতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, সোয়েডেন থেকে অনেক লেখকই যাবেন। তাদের সঙ্গে যদি একদিন 'মিট' করতে চান ব্যবস্থা করতে পারি। তবে অধিকাংশই এ সময় শহরে নেই।' আমাদের অভিপ্রায় তাঁকে পরে জানাবো বলে উঠে এলাম।

এরপর স্ট্রমগ্রেন সাহেবের মোটরে স্টক-হোম চষে বেড়ানো হল। প্রাচীন ও নবীন সুইডিশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপ কি? তাদের পুরানো যুগের কাঠের বাড়ি আর হালের পাকা বাড়ি। বর্তমান স্থাপত্য কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনগুলি? এগুলি সবই সুইডিশ স্থপতিদের মূলপরিকল্পনা। প্রাচীন বা আধুনিক কোনও যুগের কোন স্থাপত্যকলার অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। বরং সুইডিশদের এই স্থাপত্যকলাই অধুনা জগতের বহু দেশে অনুসৃত হ'চ্ছে। তাই স্ট্রমগ্রেনের সে কি গর্ব! সমুদ্র স্নানের পক্ষে কোন সাগর সৈকত সবচেয়ে ভাল, কোন কোন পাহাড়ে বরফের উপর স্কী খেলা হয় এবং কোন্ কোন্ মাঠে কখন কি স্পোর্টস উপভোগ করা যায়। কোথায় কোন নিবিড় ঘন পাইন বনের মধ্যে বেশ নিরিবিলি নির্জনে চড়ুইভাতি করার আনন্দ পাওয়া যায়; বোটে করে এখানকার ক্যানেলের ভিতর দিয়ে কিছুদিন ঘুরে আসা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যতটা ভাল, মনের স্ফূর্তির দিক দিয়েও ততটা প্রয়োজনীয়। সোয়েডেনের সমাজ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রতন্ত্র, সব কিছু বোঝাতে বোঝাতে চললেন তিনি। এদেশে রাজা থাকলেও প্রজারাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদেশের চাষবাসের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ছোট্ট দেশ এই সোয়েডেন। লোকসংখ্যা মাত্র ৭০ লক্ষ! লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মতো একটা শহরে এর চেয়ে বেশী লোক বাস করে! স্ট্রমগ্রেন সাহেব সোয়েডেনের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এ'রা অকপট দেশ-প্রেমিক। মাতৃভূমির নিন্দা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাটাকেও পাপ বলে মনে করেন।

স্ট্রমগ্রেন বলে চলেছেন—'মাত্র ত্রয়োদশ শতকে তো সোয়েডেন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তার আগে আমরা তোমাদেরই মতো মন্দিরে দেবপূজা করতাম। সে একদিন ছিল যখন সোয়েডেনের রাজ্য পশ্চিমে নরওয়ে—পূবে ফিনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-পূবে রাশিয়ার কতক অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত একই রাজা নরওয়ে ও সোয়েডেন শাসন করতেন। সোয়েডেন এখন আর কৃষি প্রধান দেশ নয়। শিল্প বাণিজ্য প্রধান বলা যায়। নানাবিধ কাঠ, কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড (উডপাল্প), লৌহপিণ্ড (আয়রণ ওর) উৎকৃষ্ট স্টীল বা ইস্পাত, জাহাজ ও জাহাজ

তৈরীর সরঞ্জাম, নানা যন্ত্রপাতি বিশেষ করে বৈদ্যুতিক কলকব্জা, সেফ্‌টি ম্যাচ এবং নোবেলের আবিষ্কৃত ডিনামাইটে সোয়েডেন পৃথিবীর রাজা।

থাক সোয়েডেন পৃথিবীর রাজা হয়ে। নোবেলের নাম শুনে আমরা বললাম পৃথিবীর এক একদিকের এক এক বিষয়ের যিনি দিকপাল তাঁদের যে সুইডিশ এ্যাকাডেমি থেকে 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হয় আমরা কি সেই এ্যাকাডেমি দেখতে যেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয় পারেন। কিন্তু আমি বলি কি নিতান্ত সাধারণ দর্শকের মতো না গিয়ে একটু ওঁদের আগে খবর দিয়ে ব্যবস্থা করে যাওয়া যাবে। 'নোবেল ল্যারিয়েট' টেগোরের দেশের কবি-দম্পতি অপরিচিতের মতো সুইডিশ এ্যাকাডেমী দেখে যাবেন এতে আমার অপরাধ হবে। অগত্যা নার্ভিক থেকে ফিরে এসে যাওয়া হবে স্থির হল।

য়ুরোপের মানুষগুলির একটা কেমন বদ্‌-অভ্যাস আছে। ওরা সব কিছুই তুলনা করে বলে। ব্রাশেলস ও কোপেনহেগেনে গিয়ে শুনলাম তারা বলছেন নিজেদের—'ছোট প্যারিস।' আমস্টার্ডাম দাবী করছেন তিনি য়ুরোপের 'ভেনিস'! স্টকহোমের পরিচয় দিলেন স্ট্রমগ্রেন সাহেব 'ভেনিস অফ দি নর্থ'!' বলে। প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরাও এ দোষটা পেয়ে ছিল। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে তাঁরা 'গ্যারিক অফ বেঙ্গল' বলতেন। মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে 'মিলটনের' তুলনা শুনেছি। স্টকহোমের বিশেষত্ব হল এটি সাগরকূলে একটি দ্বীপময় নগর। সমুদ্র তার একাধিক প্রসারিত ভুজবেষ্টনে একে রমণীয় করে তুলেছে। 'ভেনিস' দেখিনি তখনও, সুতরাং সাদৃশ্য বুঝলাম না। স্টকহোমের 'টাউনহল' দর্শনীয় বটে। স্থাপত্যকলা এবং শিল্পকলা উভয় দিক থেকেই এটি সোয়েডেনের একটি গর্বের ধন। এর সাগর ভূধর সংযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশটিও চমৎকার। আকারে খুব বড় নয় বটে, কিন্তু বিরাট এর পরিকল্পনা! সোয়েডেনের রাজপ্রাসাদ দেখলাম। বিপুলাকারের মধ্যেই তার যা কিছু রাজকীয়তা। বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য শিল্প, কলাকারু বা বিচিত্র অলংকরণের বাহুল্য নেই, কিন্তু গঠন পারিপাট্যে একটা সুন্দর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকায় এই সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপের মধ্যেও লক্ষণীয় রাজশ্রী ফুটে উঠেছে। দুটি রাজপ্রতিমূর্তির দিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একজন হলেন নৃপতি দ্বাদশ কার্ল। রাজপ্রাসাদের সামনেই মুক্ত কৃপাণ হস্তে কি যেন নির্দেশ করছেন। আর একটি হল অশ্বারোহণে নৃপতি গুস্তাভ—শহরপ্রান্তে একটি সুদৃশ্য পার্কের মধ্যে স্থাপিত।

স্থাপত্যের ন্যায় ভাস্কর্য কলাতেও সোয়েডেন যে কত বেশী অগ্রসর তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রতিমূর্তিগুলি থেকে। আরও দুটি তিনটি মূর্তির উল্লেখ করতে চাই এখানে। শিল্পী লিন্ডবার্গের পরিকল্পিত 'কুঞ্জনটিকা' এবং শিল্পী কার্ল মাইলসের পরিকল্পিত 'সূর্যোপাসক' মূর্তি দুটি স্টকহোমের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে হল। স্ট্রমগ্রেন বললেন, এই শক্তিশালী অমিত প্রতিভাধর ভাস্কর কার্ল মাইলসের পরিকল্পিত একটি সুন্দর ফোয়ারা আছে হামস্টাডে। সেটির নাম 'য়ুরোপ এণ্ড দি বুল'। আপনারা 'মিডনাইট সান' দেখে ফিরে এলে সেখানে নিয়ে যাবো। এখানে অনেক কিছুই দেখবার আছে, কিন্তু আর দেরী করবেন না। নইলে 'মিডনাইট সান' দেখতে পাবেন না, স্টকহোম পালাবে না, কিন্তু ওটি আর কয়েকদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হবেন। আমি কালই বিকেলের গাড়ীতে আপনাদের যাবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! কেমন? আমরা বললাম—'আর একটা দিন বিশ্রাম করতে চাই। পরশু যাবো। (ক্রমশ)

সুয়েজ খালের কথা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আমাদের এ পৃথিবীতে খালের অভাব নেই। তাদের গুরুত্বও কম নয়। কিন্তু অসাধারণ কিছু না ঘটলে সাধারণ মানুষ তাদের কথা সাধারণত মনে করে না। যেমন ভুলে যাচ্ছিল মানুষ সুয়েজ খালের কথা। একশ' মাইল দীর্ঘ এই জলপথ। সে-পথে নিত্য যাতায়াত করে বাণিজ্য জাহাজ। প্রতীচ্য থেকে পণ্য বহন করে আনে প্রাচ্যে। এতো নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং সেই জলপথের কথা বিশেষ করে স্মরণ রাখার কোন কারণ নেই। কিন্তু সম্প্রতি সে কারণ দেখা দিয়েছে। সুয়েজ খাল আবার সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বের শান্তি-প্রিয় জনসাধারণ উন্মুখে অধীর নেত্রে তাকিয়ে আছে সুয়েজ, সুদান, আর মিশরের দিকে। শঙ্কিত বক্ষে ভাবছে এখান থেকেই কি শুরু হবে তৃতীয় মহাসমর?

মধ্যপ্রাচ্যে আজ আগুন জ্বলছে। এতদিন যাদের চেপে রেখে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছিল সুযোগ বুঝে তারা মাথা চাড়া দিচ্ছে। ইরাণে ঘায়েল হবার পর এবার ইংরেজ ঘা খাচ্ছে মিশরের কাছে। মিশর সোজা বলে দিয়েছে ইংরেজকে যে, সুয়েজ খাল এলাকা দখল করে থাকা 'ইউনাইটেড নেশনস চার্টার' বিরোধী। সুতরাং তোমাকে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু ইংরেজ তাতে রাজী নয়। সে বলছেঃ খাল এলাকার যে সামরিক গুরুত্ব রয়েছে তাতে ঐ এলাকা মিশরের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সে যদি মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সম্মেলনে যোগদান করে এবং জাতিপুঞ্জ পরিষদের বাহিনী যদি ঐ অঞ্চল রক্ষার ভার নেয় তবেই সে তাদের হাতে ঐ এলাকা ছেড়ে দেবে। অথচ মজা হচ্ছে এই, কায়রো বা আলেকজান্দ্রিয়া যেমন মিশরীয় অঞ্চল, খাল অঞ্চলও ঠিক তাই। সুতরাং ও অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে মিশরের তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তা ছাড়া 'ইউনাইটেড নেশনস্ চার্টার' অনুযায়ী অন্য রাজ্যে সৈন্য মোতায়েন
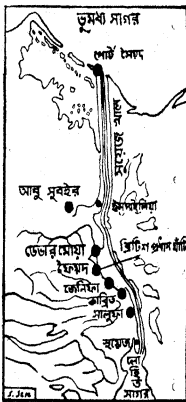
করার কোন অধিকার কোন দেশের নেই। কিন্তু ইংরেজের ছিল এককালে স্থল ও নৌ-শক্তি। সে ছিল পৃথিবীর প্রধান শক্তি। তাই পনের বছর আগে মিশরের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশাকেই সে বাধ্য করতে পেরেছিল ইঙ্গ-মিশর চুক্তি করতে। চুক্তি করে নিজের কোলে ষোলো আনা ঝোল টানতে। কিন্তু হাওয়া ঘুরে গেছে। সেই নাহাশ পাশাই আজ হুঙ্কার দিচ্ছে। মিশরের পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, যে কোন বিপদই আসুক না কেন, মিশর কিছুতেই তার ভূমিতে ইংরেজ সৈন্য থাকতে দেবে না। এ নিয়ে দু'পক্ষেরই তোড়জোড়ের অভাব নেই। এখানে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। প্রাণহানির সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। মিশরীয়দের সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যপদ্ধতির খবর আসছে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ নতুন নতুন সৈন্য, রণসম্ভার, যুদ্ধজাহাজ সমাবেশ করছে। তা ছাড়া চলছে যবনিকার অন্তরালে শলাপরামর্শ।

মিশরের পক্ষে একা ইংরেজের সংগে লড়াই করা সম্ভবপর নয়। আমেরিকা এখানে হয়ত ইংরেজকে ইরাণের মত একেবারে ডুবাবে না। সে হয়ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। রুশিয়ার রাষ্ট্রদূতের নড়াচড়ার সংবাদও আসছে। আরব লীগের সভারা সময় বুঝে কীর্তন গাইতে অভ্যস্ত। তারা এখন পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তির পক্ষেই কথা কইছেন। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যেমন বলা যায় না মিশরের এই দৃঢ়তার শেষ পরিণতি কি হবে। তবে যাই হোক না কেন, সুয়েজ খাল নিয়ে যখন একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তখন ওর পুরোণো ইতিহাস জেনে রাখা মন্দ নয়। কারণ, তাতে নতুন ইতিহাসকে বোঝার পক্ষে সাহায্য হবে।

এটা বোধহয় অনেকেরই জানা আছে যে, সুয়েজ খাল প্রাকৃতিক খাল নয়। মানুষের প্রচেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের গুণে ও যত্নে এই কৃত্রিম খালটি কর্তিত হয়েছে। ঐ খাল কর্তিত হবার ফলে বাণিজ্যিক সুবিধা যেমন হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরূপতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুয়েজ খাল স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখার জন্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সংগে যুক্ত করার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে আজকের দিন পর্যন্ত সুয়েজ খাল ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। তার ইতিহাসও কম চাঞ্চল্যকর নয়। সেই কাহিনীরই কিছুটা এখানে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব।

সুয়েজ খাল কর্তনের পরিকল্পনা অনেক-দিনের। তবে বর্তমানে যেভাবে খালটি কর্তন করা হয়েছে ফারাওদের আমলে তেমন পরি-কল্পনা ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন নীল নদ থেকে টিমসা হ্রদ পর্যন্ত খাল কাটতে। এবং তা কেটে ছিলেনও কিন্তু দেখা গেল কালক্রমে তা বুজে যাচ্ছে। অবশ্য দ্বিতীয় নেকাও, দ্বিতীয় টলেমি, সম্রাট আড্রিয়ান এবং আমরো প্রভৃতি অনেকেই চেষ্টা করেছেন তা পরিষ্কার করে জলপথকে চালু রাখতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাঁরা চেষ্টা করা ছেড়ে দেন। এটা হল ৬৪০ খৃষ্টাব্দের কথা।

অষ্টম শতাব্দীতে আবার চেষ্টা হয় খাল খনন করাবার। এবার পরিকল্পনা করা হয় ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত

করার। চেষ্টা করেন হারুণ-অল্-রসিদ। কিন্তু তাঁকে বোঝান হয় যে, অমনি খাল খনন করা রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হবে। তাই ঐ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এর আট শ' বছর পরে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে যাওয়ার পথ আবিষ্কৃত হলে ভিনিসীয়নগণ মিশরীয়দের নিকট ঐ খাল খননের পরিকল্পনা উপস্থিত করে। কিন্তু তুর্কীরা তাতে আপত্তি করে। ১৬৭১ সালে লাইবনিজ ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের নিকট মিশর অভিযানের যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেন তাতে ঐ রকম খালের কথা সমর্থন করেন। কিন্তু তা-ও কার্যকর হয়নি। ১৮৯৮ সালে নেপোলিয়ন ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যে মিশর আসেন। তিনি এসে ঐরকম খাল খনন করা সম্বন্ধে সার্ভে করার হুকুম দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঐ জলপথে ফরাসী বাহিনীকে ভারতে প্রেরণ করা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সামরিক স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই তিনি আদেশ জারী করেন। . যাহোক জে এম লেপিয়ার নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার সার্ভে করেন। তিনি রিপোর্ট করেন যে, লোহিত সাগর আর ভূমধ্যসাগরের সমতার পার্থক্য হচ্ছে প্রায় ২৯ ফিট। লাপ্লাস ও ফুরিয়ার এ অভিমত সমর্থন করতে পারলেন না। কিন্তু ১৮৪৬ সালে প্রস্পার ইফান্টিন্ নামক জনৈক সেণ্ট সিমনিস্ট Societe d'Etudes pour le Canal de Suez নামক যে সমিতি গঠন করেন সেই সমিতিও ১৮৪৬-৪৭ সালে ঐ অভিমত অগ্রাহ্য করেন। বিশ্বের উন্নয়নের জন্য সেণ্ট সিমনিস্টরা যে পরিকল্পনা রচনা করেন পানামা ও সুয়েজ খাল খনন তারই অন্তর্ভুক্ত। সমিতি যে বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করেন তাঁদের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে ঠিক হয় যে, কায়রোর পথে সুয়েজ হতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত খালটি খনন করা হবে।

প্রস্তাবিত খাল খনন করা হচ্ছে শুনে ইংরেজ কিন্তু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কারণ, সুয়েজ খাল খনন করা হলে তার প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ সহজ হবে কিন্তু ঐ জলপথে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। তা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহে সে ঐ পরিকল্পনায় নানা বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। কারণ ঐ খাল কাটা না হলে তার বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে বেশ নিরাপদেই তার বাণিজ্য ও যুদ্ধ জাহাজ ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে। সুতরাং সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে সে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু ফরাসীরা এ ব্যাপারে এগিয়ে এল। কারণ, তারা দেখল যে ও ধরণের জলপথ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের লোকসানের চেয়ে লাভ বেশী। তাঁরা তাই আরও তৎপর হল। ফার্ডিনান্ড ডি লেসেপস্ নামক জনৈক ফরাসী এ বিষয়ে বেশী উৎসাহী হয়ে উঠলেন। মিশরের ভাইসরয় আব্বাস পাশার মৃত্যুর পর লেসেপ্স্-এর ছোটকালের বন্ধু সৈয়দ পাশা ভাইসরয় হলেন। এতে তাঁর সুবিধা হয়ে গেল। সৈয়দ বন্ধুকে খাল খননের রেয়াত দিয়ে সনন্দ দিলেন। ১৮৫৪ সালে ঐ সনন্দ দেওয়া হল। তাতে বলা হল যে, 'প্রস্তাবিত খালপথে সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজ নির্বিবাদে যাতায়াত করতে পারবে। এতে কারো কোনো বিশেষ অধিকার বলে কিছু থাকবে না। ঐ সনন্দ বলে লেসেপ্স্ কাজ আরম্ভ করলেন। একটি কোম্পানী গঠন করে প্রস্তাবিত খালের পরিকল্পনা রচনা করলেন। পরবর্তী বৎসর ভাইসরয় কর্তৃক গঠিত একটি আন্তর্জাতিক কমিশন কিছু রদবদল করে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৮৫৬ সালের ৫ই জানুয়ারী লেসেপ্সকে দ্বিতীয় এবং আরও বিস্তারিত 'কনসেশনস্' দেওয়া হল। ঠিক হল এই কনসেশন খাল চালু হবার পর থেকে ৯৯ বৎসর কার্যকর থাকবে। অতঃপর অন্য কোন বন্দোবস্ত না হলে প্রস্তাবিত খাল মিশর সরকারের হাতে চলে যাবে।

উপযুক্ত সনন্দ লাভ করে ডি লেসেপ্স্ রওনা হলেন কন্স্টান্টিনোপল্। কারণ, ঐ খাল কর্তন করতে হলে তুর্কীর সুলতানের অনুমোদন প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি, ইংরেজ ছিল এই খাল খননের বিরোধী। তাদেরই কূটনৈতিক চালের ফলে প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ করা আর লেসেপ্স্-এর হল না। পরে তিনি যখন লণ্ডন যান তখন লর্ড পামারস্টোন তাঁকে জানান যে, ব্রিটিশ সরকার আলোচ্য খাল খনন একপ্রকার অসম্ভব বলে মনে করেন। তাছাড়া, ঐ খাল হলে ব্রিটিশের সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এবং প্রাচ্যে ফরাসীর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ইংরেজ ঐ খাল খননে সম্মতি দিতে পারে না। কিন্তু মজা এই যে পরবর্তী যুগে তারাই ঐ খাল জবরদখলে রেখে দিয়েছে।

সুলতানের অনুমোদন লাভ না করলেও ডি লেসেপ্স্ বসে রইলেন না। তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য য়ুরোপ পরিভ্রমণে বেরুলেন। এবং অতি সহজেই অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন। তাঁর কোম্পানীর মোট শেয়ারের সংখ্যা ছিল ৪০০,০০০ এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য ৫০০ ফ্রাঙ্ক। এর মধ্যে সৈয়দ পাশা কিনলেন ১৭৬,০০০টি শেয়ার, ফ্রান্স ২০০,০০০টি, আর বাকী শেয়ার নিল তুর্কী। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র শেয়ার কেনা হতে বিরত রইল। এখানে একথাও বলে রাখা ভাল যে, ইংরেজের শেয়ার না কেনার কারণ কোন অভিমান বা গোঁসা নয়। সে বুদ্ধিমান বেনে। তাই প্রথমে সে হাত গুটিয়ে থেকে দেখতে চাইল যে, তাতে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় কি না। কিন্তু যখন বুঝল যে, পরিকল্পনা তো নষ্ট হবেই না, বরং ঐ খালে তার উপযুক্ত অধিকার না থাকলে ভবিষ্যতে তাকে ঠকতে হবে তখনই সে কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার হাত করার চেষ্টা করল। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ সরকার দরিদ্র খেদিভ ইসমাইলকে ফাঁকি দিয়ে সুয়েজ খাল কোম্পানীর শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার হস্তগত করে ফেলল। এই শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে ডিসরেলী কমন্স সভায় যে বিবৃতি দেন তাতে বলেন, "অর্থ বিনিয়োগ হিসাবে আমি এই শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করিনি......বাণিজ্যিক স্পেকুলেশন হিসাবেও আমি এটা অনুমোদন করিনি......আমি একে অনুমোদন করেছি রাজনৈতিক কাজ হিসাবে। আমি বিশ্বাস করি এতে সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।......ইংরেজ জাতি চায় যে, তার সাম্রাজ্য রক্ষা পাক, শক্তিশালী হোক। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেলে নিশ্চয় তারা শঙ্কিত হবে না। কারণ তারা দেখছে ঐ খালে অর্থ বিনিয়োগে আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল আমাদের প্রভাবাধীনে এসে যাচ্ছে, ভারত সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য উপনিবেশে যাতায়াতের সুবিধা হয়ে যাচ্ছে।" উদ্ধৃত অংশ থেকেই ইংরেজের মনোভাব সঠিক অনুধাবন করা যায়। এই মনোভাব থেকেই সে সুয়েজ এলাকা চিরকাল স্বীয় প্রভাবাধীনে রাখতে চায়। কিন্তু ১৮৭৫ আর ১৯৫৮ সাল এক নয়! তাকে বিতাড়নের আয়োজন হয়েছে। এটা প্রকৃতিরই প্রতিশোধ!

সুয়েজ খাল কোম্পানী যার পুরো নাম হচ্ছে Compagnie Univer-

selle du Canal Maritime de Suez তার ষোল ভাগের ৭ ভাগ শেয়ারের মালিক এখন ইংরেজ। কোম্পানীটি মিশরে বিধিবদ্ধ এবং এর ৩২জন ডিরেক্টরের মধ্যে ২১ জন ফরাসী, ১০ জন ইংরেজ আর ১ জন ওলন্দাজ। কোম্পানীর পরিচালনায় ফরাসীর সংখ্যা অধিক হলেও ইংরেজের প্রভাবই বেশী। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, ডিরেক্টর বোর্ডে একজনও মিশরীয় নেই। এরকম অবস্থা হবে ভেবেই বোধহয় ইসমাইল পাশা তাঁর পূর্বতন ভাইসরয় সৈয়দ পাশা কর্তৃক প্রদত্ত 'ফরমান' পালটে দিতে চেয়ে বলেছিলেনঃ "আমি চাই যে, খালটি মিশরের সম্পত্তি হোক, মিশর যেন খালের সম্পত্তি না হয়ে দাঁড়ায়।" শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে। অর্থাভাবই বিশেষ করে তাকে সে পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে।

যাহোক, ১৮৫৯ সনের ২৫শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে খাল খননের কাজ আরম্ভ হল। খাল খননের কাজ সম্পূর্ণ হল ১৮৬৯ সালের নবেম্বর মাসে। এই মাসেই সৈয়দ বন্দরে খালের উদ্বোধন উৎসব হল। তারপর বিভিন্ন রাজ্যের ৬৮টি জাহাজ খালপথে যাত্রা করল। ঐ নৌবহরের নেতৃত্ব নিল Aigle নামক বাণিজ্যপোত। ১৬ই নবেম্বর বাণিজ্যপোতগুলি যাত্রা সুরু করে এবং ২০শে গিয়ে পৌঁছয় সুয়েজ বন্দরে। তারপরেই নিয়মিত জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়।

সৈয়দ বন্দর থেকে সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত সুয়েজ খালের দূরত্ব হচ্ছে এক শ' মাইল। গড়ে খালের গভীরত্ব হচ্ছে ১৩½ মিটার (১ মিটার=৩৯·৩৭ ইঞ্চি)। উপরিভাগের প্রসার হচ্ছে ১০০ থেকে ২০০ মিটার আর তলদেশের প্রসার হচ্ছে ৪৫ থেকে ১০০ মিটার।

পূর্বে সুয়েজ খাল পথে দুটো জাহাজ পাশাপাশি চলতে পারত না। তাই কিছু দূর দূর একটি করে আশ্রয়স্থল ছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল এক মাইলেরও কম। দুটো জাহাজ পাশাপাশি হলে একটি আশ্রয়স্থলে গিয়ে ঢুকলে অপরটি পাশ কাটিয়ে যেত। এখন অবশ্য আর তা দরকার হয় না। দুটো জাহাজ পাশাপাশি হলে একটি থেমে থাকে। অপরটি চলে গেলে সেও চলতে থাকে। ১৮৮৭ সালের মার্চ মাস থেকে রাতেও জাহাজ চলাচল যাতে করতে পারে তার জন্যে সার্চ লাইটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এইসব অতি আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আগে যেখানে একটি জাহাজের খাল অতিক্রম করতে লাগত ৩৬ ঘণ্টা এখন সেখানে লাগে ১৫ ঘণ্টা ৬ মিনিট। ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার-এর বেশী দ্রুত কোন জাহাজকে খাল পথে চলতে দেওয়া হয় না।

য়ুরোপ আর দূর প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব হ্রাস করে সুয়েজ খাল বিশ্ব অর্থনীতিতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে লণ্ডন থেকে বোম্বাই যেতে পূর্বে ৪৫ দিন, এখন সেখানে সুয়েজ খালের পথে যাওয়া যায় প্রায় ১৫ দিনে। খালটি হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীর কর্মব্যস্ত জলপথ। প্রতি বছর প্রায় ৬০০০ বাণিজ্যপোত (শতকরা ৫৫টিই তার ব্রিটিশ) এই খালপথ অতিক্রম করে। জলকর হিসাবে কোম্পানীর আয় হয় বৎসরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন স্বর্ণ ফ্রাঙ্ক।

১৮৫৪ ও ১৮৫৬ সালের 'কনসেশন' অনুসারে সমস্ত জাতিকে সমান জলকর বা মাশুল দিতে হয়। কারুর বেলায় কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ওতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোন বিশেষ রাজ্যের জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। মিশরের চরম অবস্থার মুখে ১৮৮১-৮২ সালে আন্তর্জাতিক চুক্তিদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষতা নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে। পরবর্তী বৎসর আগস্ট মাসে তেল-এল-কেবির-এর যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্যর গার্নেট উলসলির নির্দেশে চারদিনের জন্য খাল পথে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। খেদিভের নামেই এ কাজটি চলে। এর পর ইংরেজের দিক থেকে চেষ্টা হয় সুয়েজ খালের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন করার। ১৮৮৩ সালে খেদিভের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব সার্কুলার হিসাবে একটি প্রস্তাব প্রচার করেন। প্রস্তাবে খাল অঞ্চলের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলা হয় যে, যুদ্ধ অথবা শান্তি সব সময়ই খালপথে সমস্ত দেশের জাহাজেরই চলাচলের অধিকার থাকবে, খালে কোন যুদ্ধবিগ্রহ হতে পারবে না, খালটি হবে মিশরের রক্ষাব্যূহ এবং ঐসব প্রস্তাব কার্যকর করার দায়িত্ব হবে মিশর সরকারের।

এই প্রস্তাবে বিশেষ সায় কোন শক্তির দিক থেকে এলো না। যা হোক, অনেক বিতর্কের পর ১৮৮৫ সালে ১৮৮৩ সালের সার্কুলারের উপর ভিত্তি করে একটি নিয়মপত্র গ্রহণ করা হল। অতঃপর ১৮৮৮ সালের ২৯শে অক্টোবর কন্সটাণ্টিনোপলে অষ্টশক্তি, যথা—গ্রেটব্রিটেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিয়া, তুর্কী সুয়েজ খাল নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তাতে বলা হল, খালের জলপথে যে কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অথবা যুদ্ধজাহাজ, শান্তি অথবা যুদ্ধকালে বিনা প্রতিবন্ধকতায় চলাচল করতে পারবে।

এর পরেও সুয়েজ খাল নিয়ে বহু মনোমালিন্য, সালিশ, বৈঠক হয়েছে। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে সুয়েজ খাল একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র থাকায় মিত্রশক্তি তথা ব্রিটিশ তাকে নিজের কব্জির ভিতর পুরোপুরি রেখে দিয়েছিল। কারণ সে জানত সুয়েজ খাল হারালে নাভিকেন্দ্রের সংগে যোগ রাখা তার পক্ষে মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে তার নীতি অনুসারেই দখল ব্যবস্থা বজায় রেখে যাচ্ছে। কিন্তু এখন চাকা ঘুরেছে। মিশর আর সুয়েজ খালকে অপরের সম্পত্তি করে রাখতে রাজী নয়। তাই লড়াই চলছে—অবশ্য ঠাণ্ডা লড়াই। ইরাণের মত শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে মিশর থেকেও পাততাড়ি গুটোতে হবে কিনা কে জানে?

লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সমস্ত লণ্ডন শহরে রঙ্গালয়ের সংখ্যা কত, সেকথা মনে মনে হিসেব করে সহজে বলা হয়তো সম্ভব নয়। তবে ওয়েস্ট এণ্ডে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার এপাশে-ওপাশে অলিতে-গলিতে এত রঙ্গালয় চোখে পড়ে যে, বিদেশীর পক্ষে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ লম্বা 'কিউ'এর দিকে তাকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া অন্য পাড়ায় ছোটখাটো থিয়েটার তো আছেই। নতুন লেখকের ভালো নাটক কিম্বা পুরানো লেখকের নতুন বই প্রথমে ওয়েস্ট এণ্ডের থিয়েটারেই দেখা যায়। সে-পাড়ায় অভিনয় দেখার আগ্রহ লণ্ডনের জনসাধারণের খুব বেশি। লোকে 'কিউ'এ দাঁড়ায় দু' শিলিংএর টিকিটের জন্য—সবচেয়ে কম দামী টিকিট। রোদ বৃষ্টি কুয়াশা তুষার—কিছুতেই উৎসাহ হারায় না তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে এতটুকু বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। এই দু' শিলিংএর 'কিউ'এ যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খুব ভালো নয়, সেকথা বললে ভুল হবে। ইচ্ছে করলে এদের অনেকেই পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট দু মাস আগে কিনে রাখতে পারতো। কিন্তু তা করেনি, কেননা, 'কিউ'এ দাঁড়াতে এদের ভালো লাগে আর যেখানে কম পয়সায় কাজ সারা যায়, সেখানে বেশি পয়সা ইংরেজ সহজে খরচ করে না। আজ ইচ্ছে করলেও ফল হবে না, কারণ অন্য টিকিট সব শেষ হয়ে গেছে। তাই যারা বিদেশী কিম্বা যাদের বয়স খুব বেশি অথবা খুব বড়লোক, তারা আগে থেকে দামী চেয়ারের বন্দোবস্ত করে রাখে।

যারা অশিক্ষিত, নাটকের ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যাদের নেই, যারা চায় শুধু বিশেষ পোষাকে বিশেষ নাচ আর আনন্দ, সেই 'পাবলিকে'র দোহাই দিয়ে ওয়েস্ট এণ্ড রঙ্গালয়ের কর্তারা বিশেষ নাটকের বন্দোবস্ত করবে না কিম্বা কোন নাট্যকার তাদের খুশি করবার জন্যে নিজের অক্ষমতা অস্বীকার করে কখনো বলবে না, 'পাবলিক' এই চায়। ইংরেজ নাট্যকারের কাজ হলো দেশের রুচিকে উন্নত করা—নাট্য-সাহিত্যে নতুন আলো ফেলে নানা-রকম পরীক্ষা করা। হীন রুচিকে সমর্থন করে শুধু পেটের দায়ে নাটক লেখা নয়। তাই লণ্ডনের রঙ্গালয়ে শিক্ষিত দর্শকের ভীড়—ছাত্রদের ঠেলাঠেলি। অভিনয় কেমন হলো, কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করলো, সেকথা দর্শক আলোচনা করে পরে

বার্নার্ড শ'

—সাধারণত থিয়েটার দেখতে দেখতে কিম্বা বাইরে বেরিয়ে প্রথম কথা হবে, নাট্যকারের দোষগুণ নিয়ে, নাটকের বিষয়বস্তু আর কলাকৌশল নিয়ে। তবু বিশেষ দর্শকের জন্য বিশেষ নাচ-গানের রঙ্গালয় আছে এবং ওয়েস্ট এণ্ডেই। আমি সেগুলির কথাই প্রথমে বলবো। সে-কর্তারা হাল্কাভাবে হাল্কা রস পরিবেশন করে। ওয়েস্ট এণ্ডের তিনটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়—উইণ্ডমিল, ক্যাসিনো, হিপোড্রোম্। ভদ্রসমাজে যদি হঠাৎ কোনদিন আপনি এই রঙ্গালয়গুলির নাম উল্লেখ করেন, তাহলে শিক্ষিত শ্রোতা তখুনি বুঝে নেবে, আপনার রুচি কেমন এবং আপনি কোন্ শ্রেণীর লোক। এই রঙ্গালয়গুলিতে আনন্দ উপভোগ করতে যায় সকলেই, কিন্তু চুপে-চুপে, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে খুব সাবধানে—চেনাশোনা কেউ দেখে ফেললেই মুশকিল। মনে করবে, কী জঘন্য রুচি উইণ্ডমিলে এসেছে।

এই জাতের থিয়েটারগুলির বড়ো বেশি মিল। একটি দেখলেই চলে—অন্যগুলিতে সেই একই ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা কি? যতটুকু কাপড় না হলেই চলে না, ঠিক ততটুকু কাপড় পরে মেয়েরা নাচ আর গানের মধ্যে দিয়ে আপনাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু নাচের ভংগী দেখে আর গানের ভাষা শুনে শিক্ষিতেরা ভুরু কোঁচকায়, অনেকেই উঠে যায়, আর যে সং বৃদ্ধেরা লোভ সামলাতে না পেরে এসে পড়েছে, তারা বিরক্তির রেখা মুখে ফুটিয়ে শেষ অবধি বসে থাকে। মেয়েরা এসব থিয়েটারে বড়ো একটা আসে না, আর দু-একজন কৌতূহল দমন করবার জন্যে এলেও দ্বিতীয়বার আর ভুলেও আসে না।

ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবের মুখে এই সব থিয়েটারের যতখানি নিন্দে শুনেছিলুম—এগুলি বার বার দেখার পর আমি তাদের সংগে একমত হতে পারলাম না। ইংরেজ কনজারভেটিভ—একটু এদিক-ওদিক হলে লজ্জায় তাদের কান লাল হয়ে ওঠে। সামান্য অশোভন হলে অশ্লীল মনে করে অস্বস্তি বোধ করে। উল্লিখিত রঙ্গালয়ে বসে আমার একবারও মনে হয়নি যে, এতো-টুকুও বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর মঞ্চের মেয়েদের পোষাক দেখে আমি অবাক হইনি, কারণ এমন সাজ যে কোন ব্যালেতে দেখা গেছে। তারপর তাদের গান ও রসিকতা। হয়তো এই নিয়ে শিক্ষিত ও মার্জিত দর্শকের আপত্তি। কিন্তু আমি বিদেশী, তাই ওদেশের রসিকতা ও হাস্য-রসের জাতবিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই। আলোর বন্যা, মঞ্চের কলাকৌশল, মেয়েদের সমাবেশ, আর তাদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন বাজনার আশ্চর্য সংগতি আমাকে বিস্মিত করেছে। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে, বাইরে বেরিয়ে আমার মনে হয়েছিলো, কী

দেখলাম। সুরুচি-কুরুচি, শোভন-অশোভন এসব কথা ভাববার আমার অবসর হয়নি, কারণ মঞ্চের বিচিত্র শিল্প-প্রকাশ আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিলো।

এই সঙ্গে এই জাতের ফরাসী দলের নাম উল্লেখ করতে হয়, অর্থাৎ 'ফলিবেরজা'। সম্প্রতি লণ্ডনে তাদের শাখা খোলা হয়েছে এবং এই দল লণ্ডনের অন্য তিনটি থিয়েটারকে কাণা করে দিয়েছে। ফ্রান্সের রূপসীরা ম্লান করে দিয়েছে ইংরেজ সুন্দরীদের। আর ফরাসী স্টেজ—টেকনিক দেখে মনে হয়, ইংল্যাণ্ড কত পেছিয়ে আছে। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, অপূর্ব!

অল্প অল্প আলো যেন ম্লান জ্যোৎস্না

কবি এলিয়ট

উঠেছে, মঞ্চের ওপর জমেছে মেঘ, মৃদু মৃদু বাজনা বাজছে, আর সেই মেঘে মেঘে কতো রূপসীর ভীড়—কতো রকমের রূপ প্রকাশ। তারপর অন্য বাজনা বাজলো, আলোর প্লাবনে ভরে গেল মঞ্চ, আকাশ থেকে কেমন করে নেমে এলো হাজার সুন্দরী। কখনও সমুদ্রের গভীরে জলপরীদের নাচ, কখনও আকাশের রূপে, কখনও মঞ্চের ওপর রেলগাড়ি আপনাকে অবাক করে দেবে। এই ধরণের মঞ্চগুলির মধ্যে বর্তমান লণ্ডনে ফরাসী 'ফলি-বেরজা' সর্বশ্রেষ্ঠ, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যাদের রুচি উন্নত, যারা নাচ-গান ভালোবাসে, অথচ যারা এই সব রঙ্গালয়ে গিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট হয় না, তাদের জন্য রয়েছে কভেন্ট গার্ডেন অপেরা কিম্বা স্যাড্‌লারস ওয়েলস ব্যালে। পুরাণ কিম্বা ইতিহাস নিয়ে এরা করে গানের নাটক কিম্বা নাচের অভিনয়। তাছাড়া সমগ্র ইউরোপ থেকে আসে নানা দল। স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন—এই সব অনেক দেশের ব্যালে লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চ আচ্ছন্ন করে রাখে বহুদিন। কেনসিংটনের বিশ্ববিখ্যাত রয়েল অ্যালবার্ট হলে নানা দেশের কনসার্ট চলে রাতের পর রাত। নাচ নয়, গান নয় অভিনয় নয়, শুধু কনসার্ট—সেই বাজনা শুনতে সহস্র শ্রোতার ভীড়।

এবার লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চের আধুনিক নাটক ও নাট্যকারের কথা বলা যাক। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের তরুণতম শক্তিশালী নাট্যকার ক্রিস্টফার ফ্রাই। ফ্রাই-এর বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচে। তাঁর নাম দর্শক টেনে আনে। তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার বর্তমান ইংল্যাণ্ডে নেই। অনেক ইংরেজ সমালোচক ক্রিস্টফার ফ্রাইকে বলে আধুনিক সেক্সপীয়র। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, দি লেডী ইজ নট ফর্ বার্নিং। এই নাট্যকারের প্রত্যেকটি নাটক রাতের পর রাত লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চে চলেছে এবং দর্শকসাধারণের মন জয় করে নিয়েছে। তার আরও কয়েকটি নাটকের নাম, দি ফার্স্ট বরণ্ ভিনাস্ অবজারভড্ এবং এ ফিনিক্স টু ফ্রিকোয়েন্ট।

ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর নাটক শুধু দর্শকের মন মাতায় না, পাঠককেও গভীর তৃপ্তি দেয়। তার ভাষা যেমনি ভারি, তেমনি অভিনব। ফ্রাই-এর লেখা পড়ে মনে হয়, তার প্রেরণা ইতিহাস আর বাইবেল থেকে। ছন্দের ঝঙ্কারে, উপমার নতুনত্বে, দৃষ্টির ব্যাপকতায় তাঁর নাট্য-সাহিত্য শিল্পের সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁছেছে। তাই আজ অনেক সমালোচকের মতে তরুণ ক্রিস্টফার ফ্রাই আধুনিক ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার।

এ বছরের প্রথমে কবি টি এস এলিয়টের তৃতীয় নাটক 'ককটেল পার্টি' লেস্টার স্কোয়ারের নিউ থিয়েটারে আরম্ভ হয়। কবি এ-নাটক শেষ করবার আগেই অনেকে এর কথা জানতো এবং কবে এটি শেষ হবে, সেকথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। নাটক লেখা শেষ হলো, কিন্তু লণ্ডনে অভিনীত হলো না—এডিনবরা উৎসবে হলো এ নাটকের প্রথম অভিনয় তারপর ব্রাইটনে এবং অবশেষে লণ্ডন। অনেকের ককটেল পার্টি ভালো লাগেনি। তারা বলেছে, এ নাটকে নাকি কিছু নেই। আর কারুর কারুর মতে, অদ্ভুত নাটক। ককটেল পার্টি চললো অনেকদিন—এলিয়টের ভাব আর ভাষা আবার লোককে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো তার ক্ষমতার কথা। এ নাটকে অভিনেতা ও অভিনয়ের কথা কেউ উল্লেখ করলো না। ককটেল পার্টি সম্পর্কে একমাত্র আলোচনা হলো, এলিয়ট।

ফ্রাই ও এলিয়ট ছাড়া আলডুস হাক্সলি, জে বি প্রিস্টলি—এরাও রঙ্গমঞ্চের জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে নতুন নাটক লিখে নানা রকম পরীক্ষা করেছে এবং তাদের নাটক হলেই দর্শক-সাধারণ বিনা দ্বিধায় টিকিট কাটে। কিন্তু এদের নাটক দেখে বাইরে এসে

মাইকেল রেডগ্রেভ

লোকে আগে অভিনয়ের আলোচনা করে—পরে নাটকের বিষয়বস্তুর কথা। বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পর তার বহু নাটক আবার নতুন করে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখানো হচ্ছে। ভীড় হচ্ছে খুব বেশী, টিকিট পাওয়া শক্ত। লোকে হাত তালি দিয়ে ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের মতো দীর্ঘ নাটক পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঠায় চেয়ারে বসে উপভোগ করছে।

আর ঘরে বাইরে শেক্সপীয়র। সারা বছরের যে কোন সময় লণ্ডনের কোন না কোন রঙ্গমঞ্চে আপনি শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে পাবেন। ওল্ড ভিক্ কোম্পানী ছাড়াও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তার নাটক নানা-ভাবে অভিনীত হয়। স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনের কথা এখানে না হয় নাই উল্লেখ করলাম।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো খোলা মাঠে শেক্সপীয়র। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে রিজেন্টস্ পার্কে শেক্সপীয়রের নানা নাটক অভিনয় করা হয়। ওপেন্ এয়ার থিয়েটারের অভিনয় প্রত্যেকের ভালো লাগে—সকলে বারবার দেখেন। বছরে শুধু দু'মাসের জন্যে তাদের আবির্ভাব তাই দর্শকের সংখ্যা বাড়ে বই কমে না।

'যাত্রা' কথাটা শুনলে আজকাল আমরা সকলেই মনে মনে হাসি। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াছবির যুগে যাত্রা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা দেশবাসী করলো না, করতে পারলো না। ইংল্যান্ড পারলো। যুগের সংগে তাল মেলাতে গিয়ে হয়তো কিছু কিছু রীতি নীতি বদলাতে হলো; কিন্তু অভিনয় মালঞ্চের প্রথম ফুল তারা বাঁচিয়ে রাখলো সযত্নে। আমার এ উক্তিতে হয়তো পাঠক-সাধারণ অবাক হবেন। কিন্তু ওপেন এয়ার থিয়েটার আমাকে এবং আরও অনেককে নিয়ে যায় শেক্সপীয়রের যুগে। যেমনি অভিনয় তেমনি প্রকাশের ধারা। আর আশ্চর্য, যে কোন আধুনিক থিয়েটারের চেয়ে ওপেন এয়ারে ভীড় হয় অনেক বেশী।

আজও শেক্সপীয়রকে সাধারণের কাছে নানারূপে তুলে ধরবার জন্যে ইংল্যান্ড যতখানি চেষ্টা করছে আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনো দেশে তাদের জাতীয় কবিকে নিয়ে ততো মাতামাতি হয়।

কিন্তু সার্থক এ মাতামাতি। 'জুলিয়াস্ সিজার' স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনে দেখলাম একরকম, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখলাম আর এক-রকম, সেই একই নাটক ওপেন্ এয়ারে দেখলাম একেবারে অন্যরকম।

বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করে বলে, শুনেছি ইংরেজের মুখে শেক্সপীয়র ছাড়া নাকি কথা নেই, তাই ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আমাদের দেশের লোকেরাও শেক্সপীয়র-শেক্সপীয়র করে ইংরেজ সাজে।

কথাটা খুব মিথ্যা নয়। ইংরেজ সাজে কিনা জানি না, তবে একথা ঠিক আমাদের দেশের লোকের ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে হয় নতুন উপলব্ধি। আর এই মহাকবিকে এমন করে বিদেশীর মনে মেলে ধরবার কৃতিত্ব বোধ হয় অভিনেতা অভিনেত্রী আর রঙ্গ-জগতের অন্যান্য লোকের প্রাপ্য। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিলো।

শুধু ইংরেজী নাটক নয়, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে ইংরেজীতে ইউরোপের আরও নানা দেশের নাটক প্রায়ই অভিনীত হয়। আর তা ছাড়া আমেরিকার নাটক তো থাকবেই। সব দেশের সব নাটক দেখবার সুযোগ আমার হয়নি, আমি শুধু ফ্রান্স ও আমেরিকার নাটকের কথাই বলবো কেন না এই দুই দেশের নাটকের মূলে আশ্চর্য প্রভেদ—অভিনয়েও।

ফরাসী নাট্যকার জাঁ পল সারত্রের (Jean Paul Sartre) নাম ইংল্যান্ডে শুধু সুপরিচিত নয়, প্রশংসিত। তার লেখা 'মেন উইদাউট শ্যাডোজ', 'এ রেসপেকটেবল্ প্রসটিটিউট' এবং আরও অনেক নাটক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে চলেছে এবং তার নতুন রচনার আশায় জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সারত্রের-দর্শন—একজিস্টেন্সিয়েলিজম্ (কথাটার সঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই, কেউ কেউ বলেন, অস্তিত্ববাদ)। সারত্রের নাটক এই 'বাদে'র ওপর ভিত্তি করে লেখা। গতি, কৌতূহল, রস—সবই আছে তার নাটকে এবং শক্তিশালী নাট্যকারের যে গুণগুলি থাকা দরকার জাঁ পল সারত্রে সেগুলি থেকে বঞ্চিত নয়, তবু কোথায় যেন একে প্রশংসা করছে বেধে যায় আর মনে হয় প্রতিক্রিয়াশীল। আর একজন ফরাসী নাট্যকার জাঁ অ্যানুই ইংল্যান্ডে সারত্রের মতো পরিচিত না হলেও তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী বলে স্বীকৃত। অ্যানুই-এর অনুভূতি ও সমবেদনা সারত্রের চেয়ে তীক্ষ্ম আর গভীর। জনসাধারণ তাকে নিয়ে উন্মত্ত না হলেও ফরাসী ও ইংল্যান্ডের শিক্ষিত মহল সারত্রের চেয়ে অ্যানুই-এর প্রতিভা বেশী সেকথা স্বীকার করে।

ইডিথ এভান্স

কিছুদিন আগে অ্যানুই-এর 'অ্যান্টিগোনে' ডাচেস্ থিয়েটারে হয়ে গেল। ফ্রান্সে এই অসামান্য নাটক নাকি ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো; কিন্তু লণ্ডনে চললো না। ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর অনুবাদ করা অ্যানুই-এর নাটক 'রিং রাউণ্ড দি মুন' গ্লোব থিয়েটারে চলছে—খুব ভালো চলছে। নাটকের শেষের দিকে নাট্যকারের মতামত, সম্পদের অসারতা ইত্যাদি জোর করে উপদেশ শোনাবার মতো মনে হলেও নাটকের গঠন ও সুঅভিনয়ের জন্যে এসব কথা লোকের মনে হয়তো ওঠেনি। 'রিং রাউণ্ড দি মুন' সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অভিনেত্রী মারগারেট রাদারফোর্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অ্যানুই-এর আর একটি প্রশংসিত নাটকের নাম, 'পয়েন্ট অফ্ ডিপারচার'। লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে তিনখানি উচ্চপ্রশংসিত আমেরিকান নাটক—'হার্ভি', 'ডেথ্ অফ এ সেলসম্যান' আর 'স্ট্রীট কার নেমড্ ডিজায়ার্'।

ডেথ্ অফ এ সেলস্‌ম্যান প্রসিদ্ধ হয়েছে পল মুনির অভিনয়ের জন্যে। এ নাটকের বিষয়বস্তু হলো সেলসম্যানের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা। 'হার্ভি' মনস্তত্ত্বমূলক। স্ট্রীট কার্ নেমড্ ডিজায়ার'-এর লেখক বর্তমান আমেরিকার জনপ্রিয় নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস্। যে তিনখানি আমেরিকান নাটকের নাম করলাম তার প্রত্যেকটি লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে বহুদিন চলেছে এবং অনেক ইংরেজ দর্শক এগুলি নিয়ে মেতে উঠলেও স্বীকার করেছেন যে তাদের মনে নাটকের বিষয়বস্তু ফরাসী নাটকের মতো গভীরভাবে রেখাপাত করেনি। 'স্ট্রীট কারে' ভিভিয়েন্ লি'র অভিনয় খুবই ভালো; কিন্তু টেনেসি উইলিয়ামস্-এর রচনা তাদের ভালো লাগেনি। 'ডেথ্ অফ্ এ সেলসম্যান' তবু কিছু রেখাপাত করেছে। পল মুনির অভিনয়

নৈপুণ্য না থাকলে এ নাটকের কি পরিণাম হতো বলা কঠিন। কেউ কেউ অবশ্য বলতে ছাড়েনি, পল্ মুনিই মাঝে মাঝে বড় মেলো-ড্রামাটিক অভিনয় করেছে, আমেরিকান অভিনেতা হলে যা হয়। আর কেউ কেউ (বিদেশী দর্শক) মরবিড্ বলতে ছাড়েনি। 'হার্ভি' একটি খরগোসের নাম। নাটকের নায়ক অভিনেতা জো ব্রাউন সব সময় মনে করতো একটি খরগোস তার পাশে পাশে রয়েছে। অবশেষে নানা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নায়কের মনের এ অবস্থা দূর করা হলো। সাধারণের মতে এ নাটক গভীর কিছু না হলেও নাট্যকারের প্রচেষ্টা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা যায়। এমনকি অভিনয়ের শেষে জো ব্রাউন দর্শক সাধারণকে উদ্দেশ করে বলেছিলো, আমেরিকায় হাজার হাজার রাত আমি এ নাটকে অভিনয় করেছি; কিন্তু লণ্ডনের দর্শকদের মতো এমন প্রাণময় অভ্যর্থনা সেখানে পাইনি।

ইংল্যাণ্ডে আমেরিকান নাটকের চেয়ে ফরাসী নাটক বেশী প্রিয়। যা স্বাভাবিক, যা সংগত তাই নিয়ে ফরাসী নাটক এবং সেই কারণে অভিনয়ও সংযত। ফরাসী নাটকে দেখি সাধারণ মানুষের ভীড়, তারা আমাদের যেন একান্ত আপনার। তারা কথা বলে সাধারণ মানুষের মতো, তাদের সব কিছুই আমাদের বড়ো চেনা। আর আমেরিকান নাটকে যেসব চরিত্র দেখি তাদের যেন ঠিক চিনতে পারি না। অনেক সময় রক্ত মাংসে গড়া মানুষ বলে তাদের মনে হয় না—তাদের চলা বলা যেন যন্ত্রের মতো। তাই অভিনয়ও হয় মেলোড্রামাটিক। যে ক'টি আধুনিক আমেরিকান নাটক দেখেছি তার মধ্যে কখনও কখনও স্পন্দন শুনতে পেলেও গোটা জীবনকে পাইনি। তাই মঞ্চের কলা কৌশল মনে রাখবার মতো হলেও বর্তমান আমেরিকান নাটকের চরিত্রগুলি হৃদয়ের খুব কাছে আসে না। ছেলেবেলা থেকে শুনি

জার্মান ব্যালেরিনা মেরিয়েটা হেনি

ফরাসীরা ভাবপ্রবণ, তাদের উচ্ছ্বাস বেশী, গতি চঞ্চল জীবনকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক ফরাসী নাট্যকাররা রঙ্গমঞ্চের জন্যে বিশেষভাবে লেখা সাধারণ নাটকেও যে সংযমের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। তাই মঞ্চের কলাকৌশল সাধারণ হলেও ফরাসী নাটক মনের গভীরে ফুল ফোটায়।

ইংরেজী ফরাসী কিংবা আমেরিকান নাটকে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী সুন্দর রঙ্গমঞ্চে সমান অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, ময়রা লিস্টার, উইণ্ডি হিলার, বেটি অ্যান ডেভিস, ভিভিয়েন লি এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, মাইকেল রেডগ্রেভ, হার্বার্ট মারশ্যাল অন্যতম।

ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, স্যার লরেন্স ও মাইকেল রেডগ্রেভ—এদের জন্যে আধুনিক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু অভিনয় নয়, জনসাধারণের সুপ্ত সুরুচিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে তারা নানাভাবে চেষ্টা করে এবং একথা বারবার সংরক্ষণশীল ইংরেজকে বোঝায় যে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাধারার সংগে পরিচিত না হলে আজ শুধু পিছিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সিবিল থর্নডাইক, তার অভিনেত্রী আত্মীয়া এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যালের আশ্চর্য উদ্যম মনে রাখবার মতো।

হবোর্নে কনওয়ে হলে এ সভার আয়োজন করেছিলো ইণ্ডিয়া লীগ। সিবিল থর্নডাইক, এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যাল রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনেক আবৃত্তি করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলো এবং তাদের উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিলো অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ হয়তো সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠবে।
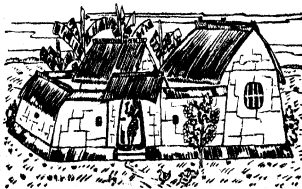
শারদীয় সংখ্যার ছোটগল্প

নারায়ণ চৌধুরী

বাঙলা পত্র-পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাগুলি প্রতিবারেই অসংখ্য ছোট গল্পের সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বলাই বাহুল্য, এবারেও সেই চিরাভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। শারদীয় সংখ্যাগুলিতে ছোট গল্পের অতিরিক্ত সমাবেশের কতকগুলি বিশেষ কারণ বর্তমান। ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমতঃ বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বিভাগটি যত সমৃদ্ধ, এমন আর কোন বিভাগই নয়। বাঙলায় ছোট গল্পের ঐতিহ্য যদিও খুব বেশি দিনের নয় তবু এরই মধ্যে তার বিস্ময়কর পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছে। শিল্পরূপ হিসাবে ছোট গল্পের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য আমাদের সাহিত্যিকদের তৎপরতার অন্ত নেই। অনেক শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিকের মনোযোগ শুধুমাত্র সাহিত্যের এই বিভাগটিতে নিবদ্ধ রয়েছে। শক্তি যেখানে সমবেতভাবে তৎপর হয়, তার ফল সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশের কথা-সাহিত্যিকদের একমনস্কতা ও সঙ্ঘবদ্ধ তৎপরতার ফলে বাঙলা ছোট গল্প আজ বিশ্ব-সাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। কি বিষয়বস্তুতে, কি আঙ্গিকের গঠনে, কি রসোত্তীর্ণতায়। কথাটা লোকের মুখে-মুখে-ফেরা ধরতাই বুলি নয়; তা বাস্তব প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই কারণে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে ছোট গল্পের সমাবেশ বরাবরই কিছু বেশি হয়ে থাকে; আর খুশির-দোল-দেওয়া অবকাশের-আমন্ত্রণ-মাখানো শারদীয় সংখ্যাগুলিতে যে সে সমাবেশ রীতিমতো চিত্তচমকপ্রদ হবে, তা না বললেও চলে। বাঙলা পত্র-পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে ছোট গল্পের চাহিদা সব চাইতে বেশি। শারদীয় সংখ্যাগুলিতে এই চাহিদা খুব দরাজ হাতে পূরণ করা হয়। শারদীয় সংখ্যাগুলি জনপ্রিয়ও হয় সেই কারণে এত বেশি। ছোট গল্পের এত বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আর কোন দেশের পত্র-পত্রিকা কোন উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করে কিনা জানি না। বলতে গেলে, বাঙলা শারদীয় সংখ্যাগুলি ছোট গল্পের ঐশ্বর্যপ্রসাদাৎ নিজেই ছোটখাটো একটা 'ইনস্টিটিউশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারদীয় সংখ্যাগুলির উৎকর্ষের মানবৃদ্ধির উত্তরোত্তর তাড়নায় এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার অনুপ্রেরণায় এই ইনস্টিটিউশনকে ক্রমেই অধিক সুসম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যত দিন যাচ্ছে, তত শারদীয় সংখ্যাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। শারদীয় সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছোট গল্প —সাহিত্যিক-সমালোচক মহলে রীতিমতো আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও যে আলোচনার উৎসাহ সংক্রামিত হয়েছে, নানা লক্ষণে তাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

শারদীয় সংখ্যাগুলিতে ছোট গল্পের অনুপাত-অতিরিক্ত সমাবেশের দ্বিতীয় কারণ, পূজোর আবহাওয়া। পূজোর কিছুদিন আগে থেকেই বাঙলার আকাশে-বাতাসে একটা লঘু স্ফূর্তির রঙীন ছায়া দুলতে থাকে। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ, সোনা-মাখানো রোদ আর এই রঙীন ছায়ার ইশারা বাঙালীমাত্রকেই এই সময়ে আমোদ-প্রয়াসী, আর সেই অনুপাতে চিন্তাবিমুখ করে তোলে। আমোদপ্রবণতার সঙ্গে রসের যোগ অতি নিবিড়, এই কারণে মনমাত্রই খানিকটা রসাপ্লুত হয়ে ওঠে। ভারি কাজের তাগিদ কিছুদিনের জন্য পিছনে পড়ে থাকে, দায়িত্ববোধ শিকায় ওঠে, পূজোর আনন্দ-সম্ভাবনায় মন কেবলি রস আহরণ করে বেড়াতে চায়। মনের এই রসোন্মুখ প্রবণতা সৃজনধর্মী সাহিত্যের মাধ্যমে যত সহজে ও সুন্দরভাবে পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর কিছুতে নয়। আর যেহেতু ছোট গল্প সৃজনধর্মী সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ, সেই হেতু এই সময়ে রসের যোগান দেওয়ার কাজে ছোট গল্প একটি মুখ্য ক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ছোট গল্প লেখকেরা শারদীয় সংখ্যাগুলির জন্য দু হাতে গল্প লিখতে থাকেন; দেখতে দেখতে শারদীয় সংখ্যাগুলির ডালা ছোট গল্পের সম্ভারে ভরে ওঠে। বাঙালী পাঠকের দরবারে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ কিম্বা তথ্যমূলক আলোচনার সমাদর যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু এই সমাদর-ক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। পাঠকদের ভাবখানা এই যে, ভেবে-চিন্তে, বিচার-বিবেচনা করে পড়বার জন্যে যে সকল রচনা, তার জন্যে তো গোটা বৎসরই পড়ে আছে, এখন আনন্দ আহরণের কাল, আনন্দটাই দু হাতে লুটে নেওয়া যাক, পরে অবকাশ মতো গুরুগম্ভীর সন্দর্ভাবলীর দিকে নজর দেওয়া যাবে। ভাবনাচিন্তার দায়িত্ব আজকের মতো তোলা থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কেননা, ভাবনা-চিন্তার দায় থেকে মানুষকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই ছুটি, আর রসের আনন্দে গা ঢেলে দেওয়াতেই ছুটির যথার্থ সার্থকতা। শারদীয় সংখ্যাগুলিতে অন্যান্য ধরণের রচনার তুলনায় ছোট গল্পের কেন এত সংখ্যাধিক্য, উপরের ব্যাখ্যার মধ্যে তার অন্যতম হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে।

তৃতীয়তঃ, আজকের কাল ব্যস্ততার কাল, অস্বাভাবিক গতিবেগের কাল। এই কালে ছোট গল্পের ব্যাপক সমাদর না হয়ে যায় না। ছোট গল্পের আয়তন মোটামুটি সংক্ষিপ্ত, অথচ কবিতার মতো নিটোল-সম্পূর্ণ তার রূপ। ব্যস্ততার তাড়নায় তাড়িত আজকের দিনের পাঠক একই কালে ভালো জিনিস আর সংক্ষিপ্ত জিনিস চায়। শারদীয় অবকাশের অযুত সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে পাঠক-মনের এই প্রবণতা বুঝি আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করার এবং তার থেকে পরিপূর্ণ একটি স্বাদ গ্রহণের যোগ্য রচনা বলতে কবিতার পরে ছোট গল্পকেই বোঝায়। কবিতার পাঠক-সংখ্যা নানা কারণে সীমাবদ্ধ, সুতরাং এ-যুগের পাঠকের মুখ্য ঝোঁক গিয়ে পড়েছে ছোট গল্পের উপরে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি খণ্ড খণ্ড রচনা-সঙ্কলন বই কিছু নয়। শারদীয় সংখ্যা-

গুলিও তাই। সেই কারণে এখানে ভারি আকার ও আয়তনের রচনার তুলনায় সংক্ষিপ্ত রচনার চাহিদাই বেশি। আর এই সংক্ষিপ্ত রচনাবলীর মধ্যে ছোট গল্পের দাবীই যে সর্বাগ্রগণ্য, সে কথা বোধ করি না বোঝালেও চলে। প্রকাশকদের তৎপরতা সম্বৎসরের পরিধিতে ব্যাপ্ত আর পূর্ণাঙ্গ এক-একটি গ্রন্থ নিয়ে তাঁদের কারবার। সেজন্যে প্রকাশক মহলে ছোট গল্পের চাহিদা কম। কিন্তু পত্র-পত্রিকার পরিচালক আর সম্পাদকদের ছোট গল্প সম্পর্কে উদাসীন থাকলে মোটেই চলে না। বলতে গেলে সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রধান নির্ভরই হলো ছোট গল্প। শারদীয় সংখ্যা সম্পাদন-কালে এই নির্ভরতা আরও একান্ত হয়ে ওঠে। যে শারদীয় সংখ্যায় ছোট গল্পের সব চাইতে বেশি সমাবেশ আর সব চাইতে উৎকর্ষ, পাঠক মহলে সে সংখ্যাগুলিরই কদর সব চাইতে বেশি।

চতুর্থতঃ এবং শেষতঃ, ছোট গল্প লেখকেরা শারদীয় সংখ্যাগুলির জন্য খুব যত্ন করে

বাঙলা লোকশিল্পের ধারা শুকিয়ে গেছে। সমাজের কেন্দ্রবিন্দু যদি পল্লী না হয়, তাহলে কারুকর্মে লোকশিল্পের স্বভাবগত লাবণ্য ঘুচে যাবেই। তাহলেও প্রতিমা নির্মাণের মধ্যে এই ঘোর একালেও বাঙলার দেশজ-শিল্পরীতি কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে ছিল। পূজামত্ত কলকাতা শহর সুরুচির মুখে তুড়ি দিয়ে শিল্পশ্রীমণ্ডিত সেই দেবীমূর্তিকে মনে হয় চিরতরে বিসর্জন দিয়েছে। দেবীমূর্তিকে নারীমূর্তিতে পরিণত করার এই উৎকট প্রয়াস দেখে কোনো দেশপূজ্য শিল্পী এক ছাত্রদলকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'ইনি যে দেখছি দ্বিচারিণী! বাড়িতে পাঠিয়ে দিস।' এখন তো মনে হয় শিগগিরই প্ল্যাস্টিকে ঢালাই-করা রমণী প্রতিমার রূপযৌবন ভেদ করে নিঅন আলোর বিচ্ছুরণ দেখে চিত্ত চমৎকৃত হবে। সঙ্গে আছে হিন্দী 'ফিলিমের' গানা অর্থাৎ কিনা নিউজিক! হিন্দী ভাষার নামে বাঙালী গর্জমান, কিন্তু দেবীপূজার প্রধান নৈবদ্য হচ্ছে বম্বেউলি-গানা! সানাইতে যারা পূজোর ভোরে একদিন আগমনী বাজাতো, লজ্জায় ধিক্কারে তারা হয়তো বিষ খেয়ে মরেছে।

তবু পূজো। বাঙালীর সমাজ-জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। সে উপলক্ষ্যে প্রতি বছর প্রভূত পরিমাণে এ-ও-তা রচনা সংকলন প্রকাশ করা হয়। দেখতে প্রায় বিজ্ঞাপনের ক্যাটালগ, কিন্তু তাতে একটা জিনিস থাকে—বাঙলাসাহিত্যের একটি সমকালীন চিত্র। এবারের পূজো সংখ্যা-গুলি মোটামুটি সুখপাঠ্য হয়েছে। জ্ঞাতসারে কি না বলা যায় না, কিন্তু লেখকদের প্রাণমন সম্প্রতি আচ্ছন্ন করে আছে খাদ্যবস্ত্র আর তৎসংক্রান্ত নানা সমস্যা। দ্রষ্টব্য ঃ প্রবন্ধে ঃ খাদ্যজিজ্ঞাসা—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, রসনা ও ও রসোগোল্লা—গোপাল হালদার, তেমনি আরো—সমুদ্রে মাছধরা, ভারতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ, চলতি বাজার, বাজার ভাও ও বহুবিবাহ ইত্যাদি। গল্প উপন্যাসেও খাদ্য আর স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসা বর্তমান ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—সঞ্জীবন ফার্মেসী (উপন্যাস), প্রমথনাথ বিশীর—ধনে পাতা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—বিয়াল্লিশের একটি পৃষ্ঠা এবং মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের—ফেরিওলা, দ্রষ্টব্য। এবিষয়ের কবিতার মধ্যে যতীন্দ্র সেনগুপ্তের—দুবেলা দুমুঠো, আর—হাটের কবি, পান্তা ভাতেই পাওয়া গেল।

এই সঙ্গে বিশেষ করে নানা ধরনের ইতিহাস ঘেঁষা আলোচনা এবং গল্পগুলি উল্লেখ করতে হয়। যথা ঃ লোকশিল্পের ধারা—মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, পুরাণে চন্দ্র—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, চাই আনন্দের সাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু, বাঙলা সাময়িকপত্র—অজিত দত্ত, মুসলমান আমলে বৈদেশিক চিকিৎসক—সৌরীন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ—সুধীর কর, জাহানারা—সুলতা কর, রামমোহন—সুশীলকুমার দে, মহেন-জো-দড়োর পতন—প্রমথনাথ বিশী। রাজনীতিতে নিরুৎসাহ চোখে পড়বার মতো।

পূজো সংখ্যার ঝুলি ঝাড়তেই আর দুটি রত্ন লাভ করা গেল, বহুদিন পরে পরশুরামের দুটি অপরূপ রসরচনা ঃ ভরতের ঝুমঝুমি, আর—রেবতীর পতিলাভ। সত্তর উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীরাজশেখর বসু প্রমাণ দিলেন হাস্যরস পুরোনো মদের মতো, যত দিন যায় ততই'তা আরো পরিপক্ক, ততই তার আরো সৌরভ, সুস্বাদ।

ইতিমধ্যে প্রচুর নতুন বই বেরিয়েছে। খণ্ডিত বাঙলায় বইয়ের যা কম-কাটতি সে কথা ভাবলে বই ছাপায় এই অপরিসীম উদ্যম দেখে আশ্চর্য লাগে। সবাই জানে খাদ্যের অভাবে কেউ বাঁচে না। বাঙালীর কিন্তু আরো একটু চাই—বই।

এবং কাব্যগ্রন্থই বা নয় কেন? পাঠক কম সেকথা স্বীকার্য। কিন্তু কবিতা এ যুগে অচল একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের বিব্রত করতেই বোধ করি নিয়মিত কবিতার বই ছাপা হচ্ছে এবং ফুরিয়েও যাচ্ছে। কবিতা যেদিন চলবে না সেদিন আর যা চলবে তা মেকির চাইতেও মেকি। নতুন কবিতার বই ঃ (১) ছন্দ চতুর্দশী—মোহিতলাল মজুমদার (ছোটো বই, অনেকগুলি সনেট)· (২) হংস-মিথুন—প্রমথনাথ বিশী (১৯২৬ সাল থেকে একাল পর্যন্ত লেখা লিরিকের সুন্দর সংগ্রহ। বহু প্রতীক্ষিত।); (৩) মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় —মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২-৫১ এই দশ বছরের রচনা থেকে সংকলন)।

রবীন্দ্রনাথের স্বরবিতান ২১শ খণ্ড এখন পাওয়া যাচ্ছে। এতে আছে ভানুসিংহের পদাবলী থেকে ৯খানি গানের স্বরলিপি।

বহুকাল পরে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' ছাপা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'শরৎচন্দ্র বক্তৃতার'-র জন্য এবার আমন্ত্রণ করেছেন ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে। খুব সম্ভব তাঁর বক্তৃতার বিষয় হবে 'রবীন্দ্রনাথ'।

বাঙলা সাহিত্যে অনাদৃত দপ্তর হচ্ছে বিদেশী ভাষার অনুবাদ। সেদিকেও ধুলোবালি সাফ করার কাজ চলছে এটা আশার কথা। উল্লেখযোগ্য ঃ (১) জওহরলালের—বিশ্বইতিহাস প্রসঙ্গ। (২) রোমাঁ রলাঁর—জাঁ ক্রিস্তফ। ২য় খণ্ডের অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, ৩য় খণ্ডের পুষ্পময়ী বসু অনুবাদ করেছেন। (৩) ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কার—রেইনবো।

সুখলতা রাও লিখিত ছোটদের 'গল্পের বই' আর 'আরো গল্প' মনে হয় যেন একযুগ আগে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। লেখিকার নিজের আঁকা ছবিসহ সেই বই দুখানি একত্রে এতকাল পরে 'গল্প আর গল্প' নামে প্রকাশ হয়েছে।

হালের লেখা উপন্যাসের মধ্যে কয়েকখানা ঃ (১) উত্তরঙ্গ—সমরেশ বসু। লেখকের প্রথম উপন্যাস। (২) আর একদিন—গোপাল হালদার। পূর্ব প্রকাশিত 'একদা' আর 'অন্যদিন'-এর পরবর্তী খণ্ড। (৩) চলাচল—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-বিজ্ঞান ক্লাসের ছাত্রী এ উপন্যাসের নায়িকা। (৪) জলজঙ্গল—মনোজ বসু। বঙ্গোপসাগরের ধারঘেঁষা বাঙলাদেশের কাহিনী। (৫) কাদামাটির দুর্গ—প্রবোধকুমার সান্যাল। (৬) একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী—অমরেন্দ্র ঘোষ এবং (৭) কালের মন্দিরা—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপন্যাসের নতুন সংস্করণ ঃ (ক) সীতা দেবীর পরভৃতিকা। (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্পণ। (গ) বনফুলের জঙ্গম (৪র্থ ও ৫ম খণ্ড) এবং (ঘ) মনোজ বসুর সৈনিক।

হাসির গল্পের নতুন বই শিবরাম চক্রবর্তীর (১) হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ আর (২) আপনি কি হারাইতেছেন জানেন না। গল্পের বিষয় গুরুগম্ভীর। হাসির ধারে সব ভারই কেটে যায়, যদিও হাসতে গিয়ে ভাবতে হয় একবার।

'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের শক্তিমান নবীন লেখক সমরেশ বসুকে অভিনন্দিত করে সিগনেট প্রেস পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

তুম্বুরু। হাঁ দেবতা! তোমার ঢেঁকিকে হুকুম কর, সে আমাদের বিবাহ ক'রে নিয়ে যাক্।

নারদ। সে যা ভাল বিবেচনা হয় করা যাবে এখন। এখন কোথায় যাবে বল ?

তুম্বুরু। মদ্র দেশে।

নারদ। তোমরা কি রাজকুমারী সাবিত্রীর সঙ্গে এসেছিলে ?

তুম্বুরু। আজ্ঞে, সঙ্গে আসিনি। আমরা এসে দেখি রাজকুমারী এখানে! সেই বাবা ঠাকুর, রাজকুমারী আর তার বরকে দেখাবে ব'লে, আমাদের এখানে আস্‌তে বলেন।

মালিনী। এসে রাজকুমারীকেও দেখলুম, আর তার বরকেও দেখ্‌লুম। কিন্তু বে দেখলুম না। কেবল মালা গেঁথে ঘুরে বেড়ালুম।

নারদ। তোমারা মালাকার ?

মালিনী। হাঁ দেবতা, আমি আর আমার স্বোয়ামী—দুজনে রাজকুমারীর শিবপূজোর ফুল যোগাতুম।

নারদ। বটে! তবে ত তোমরা ভাগ্যবতী ভাগ্যবান্।

তুম্বুরু। আজ্ঞে আগে বাণ ছিলুম, এখন দিদিরাণীর ব্যাপার দেখে তেউড়ে ধনুক হ'য়ে গেছি। বর দেখ্‌লে, আমাদেরও দেখ্‌লে; কিন্তু বে ক'রলে না!

মালিনী। আমাদের মালাও নিলে না।

নারদ। বোধ হয়, এখনও সময় হয়নি।

তুম্বুরু। দেখ দেবতা, অভিমানে আর আমরা দিদিরাণীর সঙ্গে কথা কইনি।

মালিনী। দিদিরাণী সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছেল, আমরা যাইনি।

নারদ। মালা কি ক'র্‌লে ?

মালিনী। দিদিরাণী যখন নিলে না, তখন করি কি, মালা সঙ্গে নিয়ে চ'লেছি।

নারদ। কই দেখি। (মালিনীর মালা প্রদর্শন) বাঃ বাঃ! এখনও ত অটুট রয়েছে মা!

তুম্বুরু। কি! এ মালা শুকুবে? দিদিরাণী আর বরের নামে গাঁথা মালা—এ মালা শুকুবে? তা হ'লে দিদিরাণীর মুখ দেখবো না।

মালিনী। কি! এ মালা শুকুবে? এ মালা শুকুলে আমরা দুজনে জলে ঝাঁপ দেবো না।

নারদ। না না, শুকুবে কি! সাগর শুষ্ক হবে, সহস্র সূর্য্য কিরণবিতরণে নিষ্প্রভ হবে, তথাপি তোমাদের রচিত এ মালা শুকুবে না। দেখ মা, এখনও গলদেশে ধারণের সময় হয়নি ব'লে তোমাদের দিদিরাণী এ মালা গ্রহণ করেনি। এক বৎসর পরে সেই সময় আসবে, তখন চিরদিনের জন্য অটুট সৌরভে এই মালা তোমার দিদিরাণী ও তার বরের গলদেশে আশ্রয় ক'রবে। এখন আমার সঙ্গে চল।

[প্রস্থান।

(গীত)

পিরীতি লাঞ্ছনা অতি মনোব্যথা কারে কই।
তার, কাছে রাখা দূরে থাকা কিছু না যাতনা বই।
রয় যদি সে দূরে দূরে প্রাণ জ্বলে বিরহ জ্বরে,
কাছে এনে রাখলে পরে হই তপ্ত খোলায় ভাজা খই।
মালঞ্চে কামিনী ফুল, দূরে থেকে হয় প্রাণাকুল
ছুঁতে গেলে বেজায় ভুল, যেন পাকা ধানে মই।
দেখ্‌তে যেন দুধের বাটী, সরপুরিয়া পরিপাটি,
হাতটী দিলে হয়লো খাঁটি, বাঘ তাড়ান টকো দই।

ষষ্ঠ দৃশ্য—রাজবাটী।

নারদ ও অশ্বপতি।

নারদ। মহারাজ, তোমার গুণে দেব দানব গন্ধর্ব্ব সকলেই মুগ্ধ; আমিও যে তোমার ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি, এতে বিস্মিত হবার কি আছে! তুমি রাজর্ষি জনকের তুল্য নিষ্কাম সংসারী। রাজর্ষি জনকের কাছে জ্ঞানশিক্ষার্থ আমি একদিন নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়েছিলুম। সেই মহাত্মার কাছে আমি যে শিক্ষা লাভ ক'রেছিলুম, আমি এতদিনের যোগ-সাধনায় তার শতাংশের একাংশও শিক্ষা পাইনি। সুতরাং তোমার এখানে আগমনে আমারও যে কিছু স্বার্থ নেই, এটা বোধ ক'রো না। মহারাজ! তুমি মহাপ্রাণ—যোগীরও পূজ্য। তোমার রাজ্য—ধর্ম্মরাজ্য, প্রজা—চিরসুখী, কালে পর্জ্জন্য বর্ষণশীল, পৃথিবী শস্যশালিনী—চির শ্যামলা। স্ত্রী মালবী—যেন স্বয়ং সতী-জননী প্রসূতি। পুণ্য তীর্থের ন্যায়—তোমার রাজ্য-দর্শনেও পুণ্য সঞ্চিত হয়।

অশ্ব। বহু বৎসর আপনার এ দাসের গৃহে পদধূলি পড়েনি। নিজ গুণে আমাকে এই যে সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা পরিতুষ্ট ক'র্‌লেন, আমি যদি এ সমস্ত গুণের কণা মাত্রেরও অধিকারী হ'য়ে থাকি, তাও শুধু আপনার শ্রীচরণের কৃপায়। সুতরাং আমার গার্হস্থ্য জীবনে যদি কিছু ধর্ম্ম সঞ্চিত হ'য়ে থাকে সে সমস্তের অধিকারী আপনি। আমি আপনার চরণ ধ্যান ক'রে সে সমস্তই আপনাতেই সমর্পিত করি, আপনি গ্রহণ করুন। কিন্তু এই পর্য্যন্ত গুরুদেব! যদি রাজবংশে কিছুমাত্রও অধর্ম্ম স্পর্শ করে, অনুমতি করুন, শুদ্ধমাত্র আমি যেন তার ফলভোগ করি। দয়াময়, এইটী ভিক্ষা—এইটী দেখ্‌বেন—যেন আমার পিতৃপুরুষকে সে পাপ স্পর্শ না করে।

নারদ। সে কি, তোমার বংশে পাপস্পর্শ! আবার সে পাপের কিনা তোমা হ'তে উৎপত্তি হবে? এ যে অসম্ভব কথা মহারাজ!

অশ্ব। প্রভু, আপনাকে উপদেশচ্ছলে কোন কথা কওয়া ধৃষ্টতা। আপনি জানেন না,—এ কথা মনেও বিশ্বাস করা উন্মত্ততা। দয়াময়, মদ্রবংশে এক মহান্ অনর্থ সংঘটিত হবার উপক্রম হ'য়েছে। ত্রিরাত্র মধ্যে আমাকে এক দারুণ পাপ অধিকার ক'র্‌বে। এই আশঙ্কায় আমি বড় ভীত হ'য়ে আছি।

নারদ। ব'ল্‌তে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে কথাটা কি শুন্‌তে পাই না কি?

অশ্ব। কিন্তু ভয়—কেন ভয়? আমার এই সঙ্কট সময়ে ভবভয়-হারী স্বয়ং ভগবান্ আমার গৃহে। মোহান্ধ আমি, তাই ভীত হ'চ্ছি। এই ভীতিপ্রকাশেই আমাতে পাপস্পর্শ ক'র্‌ছে।

নারদ। এমনি ভক্তিমান্‌ই তুমি বটে! মহারাজ, তোমার পবিত্র হৃদয়ে যদি কখন পাপ স্পর্শ করে, আমার বিশ্বাস—সে পাপ স্পর্শমাত্র সহস্র তীর্থ ভ্রমণরূপ মহাপুণ্যে পরিণত হবে। কিন্তু মহারাজ! বিষয়টা কি, জান্‌বার ইচ্ছা হয়েছে যে।

(বেগে মালবীর প্রবেশ।)

মালবী। মহারাজ! মহারাজ! সাবিত্রী আমার ফিরে আস্‌ছে। কেও—প্রভু!—দয়াময়!—আপনি? তাইত বলি, আমার এ সৌভাগ্য কে আন্‌লে? আমার নয়নের নিধি—আজ আবার আমার সংসার আনন্দময় ক'র্‌তে ফিরে আসছে। আমার হারানিধিকে কে ফিরিয়ে এনে দেয়—কে তাকে ফিরিয়ে আনালে। তুমি—দয়াময়—তুমি না হ'লে এ অঘটন কে ঘটায়? আর ভয় কেন মহারাজ! স্বয়ং অভয়-দাতা নারায়ণ আপনার সম্মুখে। কৃপাসিন্ধু! কৃপা কর; এই দেখুন, আমার এই সুখের সংসার এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। যোগিরাজ তুল্য

অটল অচল মহানুভাব হয়েও, স্বামী আমার কন্যা বিয়োগে বালকের ন্যায় দিবারাত্র অশ্রুজল বর্ষণ ক'র্‌ছিলেন। সেই আনন্দময়ী মা আমার, আবার আমার ঘর আলো ক'র্‌তে ফিরে আস্‌ছে। কৃপানিধান! দয়া ক'রে মদ্ররাজগৃহের চারিধারে তোমার চরণরেণুর একটা গণ্ডী দিয়ে যাও,—আর যেন কোনও ক্রমে আমার ঘরে নিরানন্দ না প্রবেশ করে!

নারদ। কন্যা, কি ব'ল্‌ছ? নিরানন্দের কথা কি ব'ল্‌ছ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

মালবী। কেন প্রভু! জ্ঞানের চাপে ভিমরতি হয়ে গেছেন নাকি? সে দিন এক প্রভু এলেন, তিনিও কিছু জানেন না; আপনি এলেন, আপনিও কিছু জানেন না। অথচ বিপদ বুঝে, একটী একটী ক'রে ধীরে ধীরে এসে এখানে পদধূলি দিচ্ছেন। বলি, সমস্ত জগতে জ্ঞান বিলিয়ে নিজের জ্ঞানের ঘর খালি ক'রে ফেলেছেন নাকি? তা বেশ,—বুঝতে পারুন আর নাই পারুন মন্ত্রীরূপে আমার স্বামীকে ছটো একটা সৎপরামর্শও ত দিতে পারেন। তাতে ত আর আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বোঝবার দরকার হবে না! দয়াময়! রক্ষা করুন। মন্ত্রণায়, আশীর্ব্বাদে, দাস দাসীর হিতকর কার্য্যে মদ্রবংশের ধর্ম্ম রক্ষা করুন। কন্যা আমার ফিরে আসছে—ত্রিরাত্র অরণ্যবাস ক'রে আবার রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছে। শুভ সংবাদ কি অশুভ সংবাদ লয়ে ফিরে আসছে, তা ব'লতে পারি না। প্রাণ কাঁপছে! একমাত্র নন্দিনী—কুলের প্রদীপস্বরূপা—তথাপি তাকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে আন্‌তেও প্রাণ কাঁপছে! ভবভয়হারী! ভয় দূর করুন—কিছুক্ষণের জন্য মাতৃহৃদয়ের, সন্তাপজনিত আশঙ্কা উদ্বেগের সহস্র তরঙ্গ, আপনার বিশাল হৃদয়ে ধারণ করুন—সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণ কি করে বুঝুন,—বুঝে, অভাগিনী মাকে রক্ষা করুন। ভয় ক'র্‌ছে—আমার বড় ভয় ক'র্‌ছে—মাকে যে বক্ষে ধ'রে চুম্বন ক'র্‌ব, তা পরের কথা—মায়ের মুখের দিকে চাইতেও আমার সাহস হচ্ছে না।

নারদ। মা আস্‌ছেন—ওই সন্তানকে কৃপা ক'রে দেখা দিতে আসছেন। আহা কি রূপ! ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে সুধাময়ি! একি নিতুই-নব মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ ক'রছে! পাগল ভোলাকে ভোলাতে তোর এত রূপ কেন মা! তিনি যে তোর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি দেখলেও প্রেমানন্দে ধরায় বিলুণ্ঠিত হন!

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মালবী। মা আমার! সম্মুখে তোমার মদ্রবংশের কুলগুরু—দেবর্ষি নারদ। অগ্রে তাঁকে প্রণাম কর। (সাবিত্রীর প্রণাম)।

নারদ। কন্যাটীকে কুমারী দেখ্‌ছি না মহারাজ?

অশ্ব। হাঁ প্রভু! কন্যা আমার এখনও কুমারী।

নারদ। এ কন্যা কোথায় গিয়াছিলেন, কোথা হ'তেইবা আগমন ক'র্‌লেন? আর এমন যুবতী কন্যাকে তুমি স্বামীহস্তে সম্প্রদান ক'র্‌ছ না কেন?

অশ্ব। ইনি এই কার্য্যের জন্যই প্রেরিতা হয়েছিলেন, সম্প্রতি এই আগমন ক'র্‌লেন। ইনি যে ভর্ত্তাকে বরণ ক'রেছেন, আপনি কন্যার কাছেই তার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মা আমার! কি ক'রে এলে, না এলে, দেবর্ষির কাছে বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

সাবিত্রী। পিতৃবাক্য আর দেববাক্য উভয়ই তুল্য। সুতরাং প্রতি-গ্রহ না ক'র্‌লে ধর্ম্মে পতিত হ'তে হয়। দেব! পিতৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে আপনাকে নিবেদন করি, শ্রবণ করুন।—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয়ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। যে সময় এই ধীমান্ মহীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁর পুত্র নিতান্ত বালক। সুতরাং নিকটবর্ত্তী কোন রাজা—পূর্ব্বশত্রু—এই ছিদ্র পেয়ে তাঁর রাজ্য অপহরণ করে। রাজা দ্যুমৎসেন ভার্য্যা ও শিশু পুত্রকে সঙ্গে লয়ে বনে গমন করেন। এখন তিনি সেই মহাবনে

অবস্থিত হয়ে মহাব্রতনিষ্ঠ—তপশ্চারণ-পরায়ণ—রাজর্ষি। তাঁর পুত্র সত্যবান্, নগরে জন্মগ্রহণ ক'রেও তপোবনে ঋষিগণ মধ্যে তপস্যার আবরণে বর্দ্ধিত হয়েছেন ; অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা জ্ঞানে আমি তাঁকে মনে মনে বরণ ক'রেছি।

মালবী। মা মঙ্গলচণ্ডী! ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দেবো মা! তুমি আজ মদ্ররাজের মুখ রক্ষা ক'রেছো।

নারদ। দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবান্! তাকে বরণ ক'রেছ! কি ক'র্‌লে সাবিত্রী! হায় হায় হায়! মহারাজ, সাবিত্রী না জেনে মহৎ পাপ ক'রেছেন!

মালবী। সে কি দয়াময়! সাবিত্রী কি করেছে! হা সাবিত্রি অভাগিনি! কি ক'রে এলি ?

অশ্ব। কেন দেবর্ষে? সত্যবান্‌কে জামতা ক'র্‌লে আমার কৌলীন্যের কি হানি হবে ?

নারদ। তা নয় মহারাজ,—দ্যুমৎসেনের তুল্য কুলীন রাজা আর কে আছে ?

মালবী। তবে ?

অশ্ব। সত্যবান্ কি গুণহীন ?

নারদ। তাও নয় মহারাজ,—সত্যবানের তুল্য গুণবান্ যুবক আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও দেখ্‌তে পাই না।

মালবী। তবে? সত্যবান্ গুণবান্—কুলীন, তথাপি সাবিত্রীর বরণের কথা শুনে আপনি হায় হায় ক'রে উঠলেন কেন ?

নারদ। সত্যবানের পিতা ও মাতা উভয়েই সত্য বলেন, পুত্রও সত্যাশ্রয়ী ; এই জন্য ঋষিগণ তাঁর নাম রেখেছেন সত্যবান।

মালবী। তবে প্রভু! তাঁর দোষ কি ?

নারদ। সত্যবান্ মহেন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন, বৃহস্পতির তুল্য বুদ্ধিমান্, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমান্বিত।

মালবী। এমন সদ্‌গুণযুক্ত স্বামী ত বহু তপস্যার ফলে পাওয়া যায়, তবে মেয়ে আমার মহাপাপ ক'রেছে—একথা বললেন কেন?

অশ্ব। রাজযোগ্য সমস্ত গুণই যখন তাতে বর্ত্তমান, তা হ'লে দেবর্ষে! তার দোষ কি?

নারদ। রাজকুমার দাতা, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, রূপবান্‌, মহানুভাব, প্রিয়দর্শন।

(অলিক্ষরার প্রবেশ।)

অলি। বস্‌! তবে সে কেমন ক'রে সাবিত্রীর বর হয়!

নারদ। তাতে সারল্য নিত্য-প্রতিষ্ঠিত! মর্য্যাদাও নিশ্চলা।

অলি। সাবিত্রী! ভগিনী! বেচে বেচে এমন মহাপুরুষকেও আত্ম-সমর্পণ ক'রে এসেছ! দেবর্ষি ঠাকুরকে এ কার্য্যের জন্য ঘটক নিযুক্ত ক'র্‌তে হয়। চিরদিন ওঁর যেমন ক'রে আসা অভ্যাস, এবারেও তাই ক'র্‌তেন—তোমাকে কোথা থেকে একটা ভস্মমাখা ভুতুড়ে বুড়ো বর যোগাড় ক'রে এনে দিতেন। এবারে ত আর সেটার সুবিধে হ'ল না—চখের ওপর সোণার বিজলী নবজলধরে সংলগ্ন হ'ল,—এও কি ওঁর প্রাণে সহ্য হয়!

অশ্ব। একি মা! কে তুমি?

মালবী। সাবিত্রী!—সাবিত্রী!—মা আমার! এই অপরূপ তেজস্বিনী বালিকাটী কে? মায়ের মধুর কথায় আমার হৃদয়ে আবার নববাৎসল্যের সঞ্চার হ'ল। সাবিত্রী! আজ যেন আমি আর একটী নূতন সর্ব্বশোভাময়ী কন্যা লাভ ক'র্‌লুম। কে মা তুমি?

সাবিত্রী। ওটী আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যার্জিতা ভগিনী।—

নারদ। উনি মাণ্ডব্য-নন্দিনী, ওঁর নাম অলিক্ষরা।

অলি। মা! নন্দিনী কাছে এসেছে—সুতরাং কন্যাই আমার

পরিচয়। তারপর চুপ ক'রে রইলেন যে ঠাকুর? সাবিত্রীর সম্প্রদানে রাজাকে অনুমতি প্রদান করুন।

নারদ। কেমন ক'রে করি! একটী মাত্র মহৎদোষ সত্যবানের গুণরাশিকে অভিভূত ক'রে রেখেছে। সত্যবান্ স্বল্পায়ু। সুতরাং এ সমস্ত গুণ এক ক্ষণস্থায়ী পাত্রে রক্ষিত হ'য়ে নিষ্ফল। শুধু তাই নয়—দুঃখের কারণ হয়ে প'ড়েছে।

সকলে। সল্পায়ু! সেকি স্বল্পায়ু!

নারদ। আজ হ'তে ঠিক একবৎসর পরে সত্যবান সহসা শিরো রোগে আক্রান্ত হ'য়ে দেহত্যাগ ক'র্‌বে।

সকলে। বলেন কি?

নারদ। বিধিলিপি! এত সদ্‌গুণের আধার রাজকুমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে ও বৃদ্ধ জননীকে অকূল শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে প্রস্থান কর্‌বেন।

অলি। কেউ ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না?

নারদ। আজও পর্য্যন্ত ত কেউ পারেনি জননী!

অশ্ব। সাবিত্রী! সত্যবান্‌কে পতিত্বে স্বীকার করবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

মালবী। হা ভগবান্ পূর্ব্বজন্মে এত কি কঠোর পাপ ক'রেছিলুম যে, প্রতিদিন আমি এই কঠোর যন্ত্রণানলে দগ্ধ হচ্ছি। আর নয়—অসহ্য। নারী আমি কত সহ্য ক'র্‌ব। আমার সর্ব্বশরীর কেমন কচ্ছে। পারলুম না আর বুঝি কিছু রাখ্‌তে পারলুম না। ধর্ম্ম গেল—কন্যা গেল—মায়া মমতা স্নেহ! তোরাই বা থাকিস কেন? সব যা—একেবারে যা—আর এ অভাগিনী রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় পীড়ন ক'র্‌তে আসিস নি।

অশ্ব। সাবিত্রী! অভাগ্য সত্যবানকে পতিত্বে স্বীকার কর্‌বার সঙ্কল্প জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

অলি। আপনারও কি এই মত প্রভু?

নারদ। জেনে শুনে একজন স্বল্পায়ুর হস্তে কেমন ক'রে রাজাকে কন্যাদানের পরামর্শ দিই মা !

অলি। তা হ'লে মদ্রবংশের কুলধর্ম্ম ? তা তো আর রক্ষা হয় না ! তিন দিনের ভিতরে সাবিত্রীর কুমারী-কাল উত্তীর্ণ হবে। ধর্ম্মলোপের কাছে কি সাবিত্রীর বৈধব্যের তুলনা হ'ল !

নারদ। ধর্ম্মলোপ হ'তে যাবে কেন ? এখনও যে সময় আছে, তাতে সহস্র সহস্র সাবিত্রী যোগ্য বর এই রাজসভায় উপস্থিত করা যায়। সাবিত্রী স্বয়ম্বরা হোন। তাদের মধ্যে যোগ্য পাত্রকে মনোনীত ক'রে স্বামিত্বে বরণ করুন।

অলি। পৃথিবীর মধ্যে এক সত্যবান্ ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য বর আর দ্বিতীয় নাই।

নারদ। বেশ, পৃথিবীতে না থাকে, স্বর্গে ত আছে। ইচ্ছা কর, স্বর্গ থেকে সহস্র বর চক্ষের নিমেষে এখানে এনে উপস্থিত কর্‌ছি। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কারে চাও ?

অলি। তাদের একজনও সাবিত্রীর পদরেণু স্পর্শের যোগ্য নয় !

অশ্ব। কি কঠোর গর্ব্ববাক্য !—বল কি কল্যাণী !

অলি। দেবতার ভিতর নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র কে আছে ? গুরুপত্নীহারী ইন্দ্র চন্দ্র কি পবিত্রতাময়ী সাবিত্রীর সম্মুখে দাঁড়াতেও সাহস করে !

অশ্ব। সাবিত্রী ! তুমি নীরব কেন ? বক্তব্য যা থাকে বল। আমার আর চিন্তা কর্‌বারও অবকাশ নেই।

সাবিত্রী। ঠাকুর, সম্পত্তি-বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা একবার মাত্র ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয় ; লোকে কন্যাকে একবার মাত্র প্রদান করে ; এবং দান ক'র্‌লুম—একথাও লোকে একবারমাত্র ব'লে থাকে। অতএব আমি যাঁকে একবার পতি ব'লে বরণ ক'রেছি, তিনি দীর্ঘায়ুই হউন বা

অল্পায়ুই হউন—গুণবান্‌ই বা নিগুর্ণই হউন—তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর আমি বরণ ক'র্‌তে পারি না।

অশ্ব। এ সঙ্কটে কি করি প্রভু?

সাবিত্রী। মন—মহারাজ,—মন। সাবিত্রীর মনের দিকে লক্ষ্য করুন। লোকে অগ্রে কোন বিষয় মনে নিশ্চিত ক'রে তবে কথায় তাকে প্রকাশ করে; অবশেষে কার্য্যে তাহা অনুষ্ঠিত হয়। কন্যার মন নিয়েই স্বয়ম্বর-প্রথার প্রতিষ্ঠা। কন্যা কর্তৃক মনোনীত, নিগুর্ণ কদাকার পাত্রকেও কোন রাজা কখন প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পারেন না।

অশ্ব! কি আদেশ দয়াময়?

নারদ। বড় বিষম সমস্যা! আদেশ—কি দেবো?

সাবিত্রী। কেন,—প্রশস্ত অসীম বিস্তৃত ধর্ম্মপথ আপনার চক্ষের উপর প'ড়ে রয়েছে। সে পথের কোথায় কি, আপনি নখদর্পণের ন্যায় দেখ্‌তে পাচ্ছেন। আমাকে সেই ধর্ম্মপথে অগ্রগামিনী দেখ্‌বার জন্য যা আদেশ ক'র্‌বেন, আমি তাই ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। আদেশ করুন।

নারদ। মহারাজ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা এই সতীত্ব-ধর্ম্ম হ'তে একে বিচলিত করি, আমার এমন সাধ্য নাই। এদিকে সত্যবানে যে গুণ আছে, অন্য কোন পুরুষে তা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। অতএব আমি ইচ্ছা করি, তুমি সত্যবানকেই এই কন্যা সম্প্রদান কর। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয়।

অশ্ব। আপনি গুরু, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা পাপ। এস মা অদ্যই তোমাকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ ক'র্‌তে যাত্রা করি।

অলি। মা, আমি ব্রাহ্মণকন্যা—ব্রাহ্মণপত্নী, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার কন্যা সাবিত্রী যেন চিরায়ুষ্মতী হয়।

মালবী। কে তুমি মা, মঙ্গলচণ্ডিকার মূর্ত্তি ধ'রে আমার গৃহে উদয় হ'য়েছ?

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—আশ্রম।

অলিঙ্করা ও সাবিত্রী।

সাবিত্রী। সুখের সংসারে বাস ক'রেও স্বামীর পরিণাম চিন্তায় আমার মনে এক দণ্ডের জন্যও শান্তি নাই। দেবর্ষি নারদের সেই বজ্র-নির্ঘোষ তুল্য কঠোর ভবিষ্যদ্‌বাণী স্বপ্নে—জাগরণে—প্রতি মুহূর্ত্তেই আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে। "সত্যবান্ আজ হ'তে এক বৎসর পরে, করাল কালকবলে নিপতিত হবে"। এখনও যেন সে গম্ভীর স্বর বর্ণে বর্ণে আমি শুন্‌তে পাচ্ছি! শুনে আমি স্তম্ভিতা, জ্ঞানশূন্যা···এক মুহূর্ত্তের ভিতর সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখেছিলুম। হৃদয়ের শোণিত-তরঙ্গ যেন এক মুহূর্ত্তে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। সর্ব্বশরীরে কম্পন—কণ্ঠ অবরুদ্ধ—কিছুক্ষণের জন্য যেন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল, শুধু মা সরস্বতী কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে, আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের কথা বার ক'রে, সে সঙ্কট সময়ে মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছিলেন। তার পর আজ এক বৎসর অতীতপ্রায়। আর চার দিন মাত্র অবশিষ্ট। সম্মুখে সেই ভীষণ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী!—মনে হচ্ছে, আর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ছে—চার দিক আবার আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি। আমার অদৃষ্টে সে রাত্রি কি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত হবে!—না,—মন ব'ল্‌ছে—'না'। আমার ধর্ম্মবিশ্বাস ব'ল্‌ছে—'না'। দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা হবে! হরিনাম-উচ্চারণে চির-বিশুদ্ধ রসনা—সত্যের অধিষ্ঠানভূমি—সে রসনা থেকে মিথ্যাবাক্য নির্গত

হবে! কেমন ক'রে বিশ্বাস করি!—অলিক্ষরে, বিশ্বাস করায় যে মহা-পাপ! কেমন করে বিশ্বাস করি!

অলি। তবে কি এ কাল চতুর্দ্দশী রাত্রি কিছুতেই নির্ব্বিঘ্নে অতি-বাহিত হবে না?

সাবিত্রী। কিছুতেই হবে না।

অলি। এ নিয়তির গতি কি রোধ হয় না? বিধিলিপির কি খণ্ডন নেই?

সাবিত্রী। দেবর্ষি ব'লেছেন—গতায়ু ব্যক্তিকে কেউ কখন ফির্‌তে দেখেনি।

অলি। তুমিও কি তাই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌বে?

সাবিত্রী। কি ক'র্‌ব, আদেশ কর।

অলি। আমি আদেশ ক'র্‌ব কি! আমার হুকুমেই কি চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-তারা সকলে চলা ফেরা ক'চ্ছে যে, এই নিয়তির ভীষণ আক্রমণ থেকে তোমাকে আত্মরক্ষার উপায় ব'লে দেব?

সাবিত্রী। উপায়—আত্মরক্ষার উপায়। অকালমৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে নিস্তার দান!—সম্ভব!—অলিক্ষরে সই! এ কি সম্ভব? প্রকৃতির আক্রমণ—আমি অবলা—এ ভীষণ যুদ্ধে আমি কি তার যোগ্যা প্রতিদ্বন্দ্বিনী?

অলি। শুধু দুটো হাত পা নাড়াতেই কি প্রতিদ্বন্দ্বিতার একশেষ হ'ল! মানসিক বল কি বল নয়? মহিষাসুরের বিক্রমে যখন সমস্ত দেবতারা প্রাণ নিয়ে সুমেরু-কন্দরে গহ্বরের ভেতর মুখ লুকিয়ে বসেছিল, কে তাদের সে দারুণ বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান ক'রে, আবার অমরা-বতীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল?

সাবিত্রী। এ তুমি কি ব'লছ?

অলি। শুম্ভ-নিশুম্ভ-দলনী অবলাটী তোমার চেয়ে কত বড়?

সে ত তোমারই মতন একটী অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমকলি। হিমালয়ের শীতল সমীরণে শুধু একটু রূপের লহর তোল্‌বার জন্য, আপনার মনে, বন্য কুসুমরাশির সঙ্গে খেলায় নিযুক্ত ছিল!

সাবিত্রী। তাই ত! ঠিক্ ব'লছ ত সখি!

অলি। সেই জীবন্ত ফুলটীর সৌরভে আকুল হ'য়ে, দৈত্যরাজ শুম্ভ তাকে তুলে আন্‌তে সামান্য অনুচর প্রেরণ ক'রেছিল। ভেবেছিল—একটী ছোট মেয়ে—শুধু রূপ বই ত নয়—তার ওপর অসহায়া একাকিনী—সে শুধু দৈত্যরাজের অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের শোভা-বর্দ্ধনের জন্যই জন্ম গ্রহণ ক'রেছে। এই না ভেবে, সামান্য দুই একজন অনুচর দিয়ে মেয়েটীকে আস্‌তে আদেশ ক'রেছিল। কিন্তু সাবিত্রী, জাননা কি? কত দানব—কত দৈত্য—কত ধূম্রলোচন—কত রক্তবীজ—সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল, তবু সে অবলার কিছুমাত্র স্থানচ্যুতি হ'ল না। সে সর্ব্বনাশী যে হিমালয়-শিখরে, সেই হিমালয় শিখরে! তার পর কত চণ্ড গেল, মুণ্ড গেল, ইন্দ্রবিজয়ী—ধরণীর অধীশ্বর—তপোবলে বলীয়ান—দৈত্যপ্রধান শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই গেল, দৈত্যকুল একেবারে সবংশে নির্ম্মূল হ'ল, তথাপি ধরণীর কোন শক্তি সে অবলাকে স্থানচ্যুত ক'র্‌তে পার্‌লে না!

সাবিত্রী। এ তুমি কি ব'লছ?—অলিক্ষরে ভগিনি! এ তুমি কি ব'লছ!

অলি। ব'ল্‌ব কি—মাথা আর মুণ্ডু! সব বোঝ। বুঝে যে অজ্ঞান, তাকে বোঝায় কে? ঘুমন্তকে তুলতে পারি,—তুমি যে জেগে ঘুমুচ্ছো! দেবর্ষি ব'লেছেন—কেউ কখন দেখেনি, তাইতে তুমি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছ। কেউ দেখেনি—কেউ কি দেখ্‌বেও না? দেবর্ষি ত এমন কথা বলেননি যে, কেউ দেখ্‌বেও না।

সাবিত্রী। কই—তা বলেননি।

অলি। তবে? দেবর্ষির বাক্যে বিশ্বাস কর—তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীতে

বিশ্বাস কর, কেবল শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস ক'রতে পার্‌ছ না! তবে আর ব্রত নিয়মাদি কেন—স্বস্ত্যয়ন শান্তি কেন? শাস্ত্রে ব'লেছে—কর্ম্মযোগে নিয়তির আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এই জন্যই ত দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

সাবিত্রী। দৈবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

অলি। হাঁ—যমের সঙ্গে লড়াই!

সাবিত্রী। তাও ত বটে! শাস্ত্রার্থদর্শিনী সতী, আজ তুমি আমার চোক ফুটিয়ে দিলে। সত্যই ত! যা ঘটবে, তা নিশ্চয়ই যদি সংঘটিত হয়, তবে তার জন্য শুধু শুধু চিন্তায় ফল কি? অবশ্যম্ভাবী পরিণাম শুধু চক্ষু-জলে ত মুছে ফেলা যায় না।

অলি। চক্ষুজল!—চক্ষুজলে কি হয়! তাতে শুদ্ধমাত্র 'কাঁদবার অভিলাষ বৃদ্ধি করে। চক্ষুজলে, মসীবর্ণ অন্ধকারময় পরিণাম, আরও গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়—বিধিলিপি উজ্জ্বলতর অক্ষরে মানুষের বিভীষিকা উৎপাদন করে। জেনে শুনে দেবর্ষির ভবিষ্যদ্‌ বাক্য অগ্রাহ্য ক'রে, পিতার আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য ক'রে, সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ ক'রেছ—ইচ্ছাপূর্ব্বক অকালবৈধব্য শিয়রে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছ! এখন ভাবলে কি হবে ভাই?

সাবিত্রী। আর ভাব্‌ব না। জ্ঞানদাত্রী শিক্ষয়িত্রী সতী! অধমা ভগিনীকে পদধূলি প্রদান কর।

অলি। চিরায়ুষ্মতী হও।

সাবিত্রী। একদিকে নিয়তির আদেশ, অন্যদিকে সতীর আশীর্ব্বাদ। দুই মহাশক্তির পরস্পরে জীবন-সংগ্রাম। মন ব'ল্‌ছে—বুঝি সতীর আশীর্ব্বাদেরই জয় হবে!

অলি। তোমার মন ব'লবে না ত ব'লবে কার? তুমি যে ভগিনী—সতীকুলরাণী। তোমার কাছে এ কথা না শুন্‌লে তৃপ্তি পাব কেন?

সতীত্ব—বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নভাণ্ডারের মহামূল্য উজ্জ্বলতম রত্ন। ভাঙ্গ্‌লে আর গড়ে না। দেবত্ব হারালে দেবত্ব ফিরে পাওয়া যায়, ইন্দ্রত্ব গেলে আবার ইন্দ্রত্বেরও সৃষ্টি হয়; কিন্তু যে অমূল্য নিধি রমণী হৃদয়ের প্রিয়তম সম্পত্তি, সে সতীত্ব একবার গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-সমেত ব্রহ্মাণ্ড-বিনিময়েও আর পাওয়া যায় না। এমন মহাশক্তির কাছে অন্য তুচ্ছ শক্তির তুলনা! মায়মনোবাক্যে সতী তুমি, তুমি কিনা অদৃষ্টের আক্রমণে চিন্তাকাতরা! মুছে ফেল—ললাট থেকে বিধিলিপি মুছে ফেল। স্বেচ্ছায় মনোমত অদৃষ্টের সৃষ্টি কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

অলি! এই—এই ত তোমার যোগ্য কথা। বৈধব্য—কে দেয়? আসুক দেখি বিধাতা—স্পর্দ্ধার সঙ্গে তাকে আহ্বান করি। বৈধব্য গ্রহণ—সে ত রমণীর নিজের হাতে। পত্নী যদি নিজে ইচ্ছা না করে, তাহ'লে তাকে পতি-বিয়োগিনী করা বিধাতারও সাধ্য নাই।

সাবিত্রী। নিশ্চয়; তোমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বাঙ্গে বেঁধে কবচ ক'রেছি—প্রস্তুত হয়েছি। মনে মনে কার্য্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি—ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ ক'রেছি।

অলি। অগ্রসর হও—তোমার আদেশে মৃত্যু দ্বার থেকে এসে ফিরে যাক। বিশ্বজননীর আয়তি রক্ষা কর'বার জন্য, সমুদ্রমন্থনে আকণ্ঠ হলাহল পান ক'রেও বিশ্বেশ্বর মৃত্যুকে জয় ক'রেছিলেন। সেই অবধি নাম তাঁর মৃত্যুঞ্জয়। সখি! তুমিও সেই অলৌকিক কার্য্য নিষ্পন্ন কর। দেব দানব গন্ধর্ব্ব—সকলে সমস্বরে সতীর জয় গান করুক। সমস্ত জগৎ সাবিত্রীর জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হোক। (নেপথ্যে—সাবিত্রী!)। ওই ভাই, তোমার স্বামী আসছেন। তা হ'লে আমি আসি!—তোমায় আমি বোঝাব কি! তুমি জ্ঞানময়ী—তোমাকে বোঝাতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা।

সাবিত্রী। তুমি আমার গুরু—তুমি আবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[অলিক্ষরার প্রস্থান।

(নেপথ্যে—সাবিত্রী)

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। এই যে—এই যে। সাবিত্রী সাবিত্রী ক'রে আমি এত ডাকছি, আর তুমি নীরবে এস্থানে দাঁড়িয়ে আছ!

সাবিত্রী। কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?

সত্য। প্রয়োজন—তোমাকে প্রয়োজন! কি প্রয়োজন, তা কি জান না। অন্ধরাজা একমুহূর্ত্ত তোমার কথা না শুনলে কত কাতর হন তা কি জাননা প্রাণেশ্বরী? তার ওপর তুমি ব্রতচারিণী—উপবাসিনী।

সাবিত্রী। আমি ত তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছি!

সত্য। তোমাকে অদেয় তাঁর কি আছে! অনুমতি চেয়েছ—অনুমতি পেয়েছ; কিন্তু কত কষ্টে প্রাণ ধ'রে যে তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তা কি বুঝতে পার? তোমায় পাঠিয়ে তিনি পূজায় নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তুমি কাছে না থাকাতে পূজায় মনোনিবেশ ক'রতে পারছেন না।

(শৈব্যার প্রবেশ।)

শৈব্যা। এই যে, এই যে। ওমা! কিক'রে এসেছ মা! একদণ্ড কাছে না থাকলে যার যুগ ব'লে জ্ঞান হয়, তাকে কিনা তুমি এতক্ষণ একাকী রেখে এসেছ! দেখ্‌বে এস বৃদ্ধরাজার ব্যাপার খানা দেখ্‌বে এস। ইষ্টদেবতার নাম জপ কর্‌তে তিনি কেবল সাবিত্রী সাবিত্রী নাম মুখে উচ্চারণ ক'র্‌ছেন। দু-গণ্ডদিয়ে তাঁর দশ ধারা পড়ছে। কি ক'র্‌লে মা! বৃদ্ধ রাজর্ষি—সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সংসারের সমস্ত সামগ্রীতে

লোভ ত্যাগ ক'রে গাছের তলায় আশ্রম নিয়েছিলেন, তুমি কিনা শেষ-কালটা তাঁকে ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়ে দিলে!

সাবিত্রী। তাই ত—তাই ত—তা হ'লে কি হবে মা!

শৈব্যা। কি আর হবে! সোণার পুতুল সোণার সিংহাসন ছেড়ে বনে পড়েছ, দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা ত্যাগ ক'রে আশ্রমের কঠোর মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খাচ্ছ। এ ননীর দেহে কি কষ্ট হচ্ছে, তিনি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছেন। তাই দিবারাত্র তোমার কথাই চিন্তা করেন। চিন্তা ক'র্‌তে ক'র্‌তে তন্ময় হ'য়ে গিয়ে, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ক'র্‌তে তোমার নাম স্মরণ ক'রে বসেছেন!

সাবিত্রী আমার যে বড় ভয় ক'র্‌ছে! পিতা যে আমার জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষি, তিনি এমনটা ক'র্‌লেন কেন?

শৈব্যা। ভয় কিসের মা! স্বামী আমার অর্চ্চনার সময়েও যদি তোমাকে স্মরণ করেন, সে ত তোমাকে আশীর্ব্বাদ। মায়ার পুতুল—তুমি তার মায়ার ঘরটা দখল ক'রেছ। তোমাকে পেয়ে রাজা আবার সংসারী—বনে ব'সেও ভবিষ্যতের একটা সোণার সংসারের ছবি তাঁর মনের ভেতর জেগে উঠেছে। তুমি যে দয়া ক'রে শাল্বরাজের কুলরক্ষার জন্য এসেছো মা! পিতৃপুরুষের জলগণ্ডুষের আশা তোমা হ'তে। তার ওপর তুমি ত্রিরাত্র-ব্রত গ্রহণ ক'রেছ। তোমার বিষয় দিবারাত্র তিনি ভাব্‌বেন না ত, কার ভাবনা ভাব্‌বেন!

সত্য। নাও—চল—পিতাকে সান্ত্বনা ক'রবে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পম্পা সরোবর।

মাণ্ডব্য ও সনাতন।

মাণ্ডব্য। সনাতন জান কি? কত অসংখ্য তীর্থের প্রলোভন পরিত্যাগ করে, এই মাল্যবানের তলদেশে যে এতকাল পড়ে আছি, তার কারণ জান কি?

সনা। কিছুইত জানিনা প্রভু! আমি মনে করি, বুঝি, মাল্য-বানের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে আপনি এই স্থান যোগাসনের উপযোগী জ্ঞানে অবস্থান করেন।

মাণ্ডব্য। সৌন্দর্য্যই বটে, তবে এ পবিত্র ভারততীর্থে বহিঃসৌন্দর্য্যে মাল্যবান অপেক্ষা যে রমণীয়তর স্থান নাই, একথা ব'লতে পারি না! তবে অন্তঃসৌন্দর্য্যে মাল্যবান আমার মনশ্চক্ষে যে মহতী শোভা ধারণ ক'রে আছে, সনাতন! মন্দাকিনীনিষেবিত নন্দনেও বুঝি সে শোভার অভাব। এস্থানের একটী ক্ষুদ্র করবী গন্ধাতিশয্যে দেবকুসুম পারি-জাতকেও পরাস্ত করে। কেন জান সনাতন?

শোন তবে, মন দিয়া শোন। সহস্র পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ, গো কোটী দানের পুণ্য সঞ্চিত হবে। সনাতন! অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। স্মরণেই আমার প্রাণ বিগলিত হ'য়ে আ'সছে!—আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি! সম্মুখে হংসকারণ্ডব-সেবিতা কমলোৎপলশালিনী শুভজলা পম্পা। ঠিক ওইখানে—সনাতন! ঠিক ওই পম্পাহ্রদয়ের তরঙ্গ সিংহাসনে—যুগযুগান্ত চ'লে গেছে, স্বামী বিয়োগবিধুরা সতীর নয়ন কমল থেকে এক ফোঁটা জল পড়েছিল। সেই জলকণার লোভে দেবতারা চাতক মূর্ত্তিতে ওই সমীরণে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করেছিল।

সনা। কেমন ক'রে পড়ল, কোথা থেকে পড়ল! পিতা! পিতা! সে কোন দেবতার চক্ষের জল!

মাণ্ডব্য। এই যে ব'ল্লেম বাপ সতী-দেবতা। আমার এ পম্পা, আমার এই অরণ্যবেষ্টিত মাল্যবান, সতী দেবতার লীলাভূমি। মা আমার যখনই আসেন, তখনই এক আধ কোঁটা চখের জল, এই দরিদ্র সন্তানের আশ্রমে নিক্ষেপ ক'রে যান। সেই জলসিক্ত মৃত্তিকায় এ স্থানের তরুলতা সমস্ত সৃষ্ট হ'য়েছে। সনাতন এ হ'তে পবিত্র স্থান কি আর জগতে আছে! আমি নিম্নে পম্পাতীরে ধ্যানমগ্ন, সহসা দূর আকাশে যেন ত্রিদিব-বাহিনী অলকনন্দার ক্রন্দনকল্লোল আমার কর্ণে প্রবেশ ক'র্‌লে। হা রাম, কোথা রাম! মুহূর্ত্ত মধ্যে কাননে মাল্যবানে পম্পাজলে সেই অপূর্ব্ব শোকময় নাম অপূর্ব্ব প্রাণোন্মাদকর প্রতিধ্বনি তুলে মনের গতিতে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল। রাম রাম! কোথা রাম কোথা রাম! চেয়ে দেখি গগনমার্গে মায়াময় রথে দুরাত্মা রাবণ কর্ত্তৃক কেশপাশে নিগৃহিতা রামহৃদয় বিহারিনী জনকনন্দিনী বিচেতনা,—তথাপি পতিশোকে স্ফুরিতাধরা, রাম রাম ব'লে রোদন ক'র্‌ছেন। সনাতন চক্ষে দেখিছি, কর্ণে শুনেছি, সে তপস্বিনীর কাতর রোদন আজও পর্য্যন্ত পম্পা-জল-কল্লোল সপ্তস্বরে গান করে। যে একবার সে কাতর রোদন শুনেছে—সে হৃদয়ের গভীর যাতনায় উত্থিত রাম নাম একবার শুনেছে, সেকি আর আছে! তার পর এই সরোবর তীরে, সীতাহারা রাম—দুর্ভর নিরাশায় অবসন্ন নবজলধর—হা সীতা হা সীতা ক'রে কমল লোচন বিগলিত সুধায় যে সময় পম্পার কলেবর বৃদ্ধি করেন, সে দিনও আমি এই স্থানে। তারপর রাবণ সবংশে নিহত হ'ল, সীতার উদ্ধার হ'ল, কিন্তু শোকোচ্ছ্বাসময় সীতা রাম নাম আর ধরণী থেকে বিলুপ্ত হ'ল না।

সনা। পিতা জগতে এ স্থানের তুলনা কোথায়?

মাণ্ডব্য। আর এক দিন, সনাতন আর একদিন। এই স্থানে, ঠিক এই স্থানে আমি ধ্যানমগ্ন। এক রমণী গলিতকুষ্ঠগ্রস্থ স্বামীকে স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামী মহাপাপী, এক বেশ্যার প্রেমে

উন্মত্ত হ'য়ে স্ত্রীকে তার গৃহে বহন ক'রে নিয়ে যেতে আদেশ করে। পরিপরায়ণা, স্বামীর আদেশ পালন ক'রতে স্বামীকে স্কন্ধে ল'য়ে সেই পাপাত্মার অভিলষিত স্থানে গমন ক'রছিলেন। রাত্রি অন্ধকার—সুতরাং চ'লতে চ'লতে পথভ্রান্তা রমণী আমার যোগাসন সমীপে উপস্থিত হ'ন। পাপাত্মার ক্ষত পদ কোনও প্রকারে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে। পাপস্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার যোগভঙ্গ হয়। ক্রোধে, আমি সেই পাপিষ্ঠকে অভিশাপ প্রদান করি, যেন রজনী প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। স্বামীর অপমানে কুপিতা সতীও তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, আপনি ব্রাহ্মণ, তাতে ভগবানের অর্চ্চনায় নিযুক্ত সুতরাং আপনাকে প্রত্যভিশাপ প্রদান ক'রলুম না। তবে যদি আমি সতী হই, তা'হলে আমিও বলি যেন রাত্রি আর প্রভাত না হয়।

সনা। তারপর ?

মাণ্ডব্য। তারপর দণ্ডের পর দণ্ড গেল, দিন যায়, সূর্য্য আর উদয়াচল পরিত্যাগ ক'রবার অবকাশ পান না। সৃষ্টিলোপ পায়! সমস্ত দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলে এই স্থানে সমবেত হ'লেন। সবার অনুরোধে আমাকেই পরাভব স্বীকার ক'রতে হ'ল। সূর্য্য উঠ্‌লো। সতীর কৃপায় নরাধম স্বামী পাপমুক্ত রোগমুক্ত দিব্যদেহ ধারণ ক'রে, সতী সঙ্গে স্বর্গে স্থান প্রাপ্ত হ'ল। সনাতন, সতী ধর্ম্মেই আর্য্যাবর্ত্তের প্রতিষ্ঠা ; আর্য্যাবর্ত্তেই সতীর আশ্রয় স্থান ; আর্য্যাবর্ত্তই লীলা। এই মাল্যবানের উপত্যকায়ই আবার সেই লীলাভূমির হৃদয়—আমার তীর্থ, আমার স্বর্গ, আমার সর্ব্বস্ব। যতদিন এ দেবরাজ্যে সতীর অধিষ্ঠান, ততদিন সহস্র কোটী রাক্ষসের অত্যাচারেও এ ভারতের কোনও অনিষ্ট হ'তে পা'রবে না।—নাও সনাতন, এই চিরপবিত্রা পম্পার জল গ্রহণ কর। আর এক সতী ত্রিরাত্র ব্রত গ্রহণ ক'রে প্রায়োপবেশনে উপবিষ্টা আছেন। আমি এই মহাব্রতের হোতা—হোমানলে পূর্ণাহুতি প্রদান

ক'রে এসেছি। এই পম্পাজল শান্তিরূপে তাঁর মস্তকে প্রদান ক'রলে তবে মা আমার জল গ্রহণ ক'রবেন।

সনা। যথা আজ্ঞা—

(অলিক্ষবার প্রবেশ।)

মাণ্ডব্য। অলিক্ষরে! আর বিলম্ব ক'রছে কেন মা? তোমার সখী যে তিন দিন নিরম্বু উপবাসে অর্দ্ধমৃতা। যাও মা শীঘ্র যাও, এই জল গ্রহণ কর। এই সপ্তসতী-গৃহীত জলে অভিষিক্ত ক'রে শীঘ্র মাকে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য—আশ্রম।

দ্যুমৎসেন, শৈব্যা ও সাবিত্রী।

দ্যুমৎ। কেমন ক'রে যে প্রাণধ'রে তোমাকে এই ব্রত গ্রহণে অনুমতি দিয়েছি, তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব মা। তুমি স্বামীর মঙ্গলার্থে ব্রত গ্রহণ ক'রেচ, "ব্রতভঙ্গ কর" এমন কথা বলা আমার মত লোকের কোন ক্রমেই ত যুক্তিযুক্ত নয়, তাই 'ব্রত সমাপ্তি কর,' এই কথা আমাকে ব'লতে হ'য়েছে। কি কঠোর ব্রত! তিনদিন নিরম্বু উপবাস।

শৈব্যা। তিন দিন কই মহারাজ! চতুর্থ দিনেরও তৃতীয় প্রহর যায় যায় হ'য়েছে! সোণার প্রতিমা কাঠের পুতুল হ'য়ে গেছে!—মা উঠ; গাত্রোত্থান কর। ভবানীর কৃপায় তুমি যে জীবনে ব্রত উদ্‌যাপন ক'রেছো এই আমাদের বড় সৌভাগ্য। তোমার মুখের দিকে একবার ক'রে চেয়েছি, আর ঠক্ ঠক্ ক'রে কেঁপেছি। আর কেবল মাকে ডেকেছি, যে মা, সতীরাণী, সতীর মর্য্যাদা তুমি রক্ষা কর। সাবিত্রীকে আমার প্রাণে বাঁচিয়ে রে'খ।

দ্যুমৎ। ভগবান্ আমাকে অন্ধ ক'রেছেন—জগতের কোনও কিছু দেখার অধিকারে বঞ্চিত। তথাপি মা আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি; তোমার দেহের কি অবস্থা হ'য়েছে। যে দিন সর্ব্ব প্রথম মা লক্ষ্মী, পূর্ণশশীকলা মূর্ত্তিতে আমার গৃহে অবতীর্ণা হ'য়ে, আমাকে প্রণাম ক'রেছিলে, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে গিয়ে মস্তকে হস্তার্পণ ক'রে, স্পর্শমাত্রেই এক অপূর্ব্বরূপ রাশির আভাস অনুভব ক'রেছিলুম। আর আজ মা আশীর্ব্বাদ ক'রতে গিয়ে সর্ব্বশরীর আমার আতঙ্কে শি'হরে উঠেছে। মনে হ'য়েছে যেন সে পূর্ণিমার পূর্ণগগনের গলিত-স্বর্ণ-ধারারূপিণী-কৌমুদী, দ্বিতীয়ার ক্ষীণচন্দ্র-লেখায় পরিণত হ'য়েছে। কেন মা, এমন কঠোর ব্রতে তোমার অভিরুচি হ'ল?

সাবিত্রী। পিতা সন্তাপ ক'র্‌বেন না। ব্রত সমাপ্তির একমাত্র কারণ নিশ্চল উৎসাহ। আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন ক'রেছি। বাবা, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমি উপবাসের যৎসামান্য কষ্টও অনুভব করিনি।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

শৈব্যা। আ! বাঁচলুম্! ঠাকুর আস্‌ছেন। আসুন প্রভু, মাকে আমার শান্তিজলে অভিষিক্ত করুন।

মাণ্ডব্য। আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী।
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্ধু-ভৈরব-শোণাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবণেক্ষু-সুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ-জলাত্মকাঃ।
সপ্তৈতে সাগরাঃ সর্ব্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

সমস্ত বসুন্ধরার মধ্যে,—আকাশে পাতালে—দেবলোকে—সপ্তর্ষি-মণ্ডলে—ব্রহ্মাণ্ডের যে যে স্থলে শান্তিদায়িনী শক্তি আছ, সকলে আজ সাবিত্রীর শুভপ্রদানের জন্য শান্তি জলরূপে অবতীর্ণা হও। সকলে সুমনা হ'য়ে সাবিত্রীকে নারীর চিরসৌভাগ্য—অবৈধব্য প্রদান কর।

(অলিক্ষরা ও সতীগণের প্রবেশ)

সাবিত্রী-মস্তকে জল সেচন।

(গীত)

এস শুভদায়িনী গঙ্গে।
উথলি আকাশ তটে, পশ ঘটে সংঘট তরল তরঙ্গে॥
এস চির শুভকারী বারি—
যমুনা বরুণা উছলিত করুণা
নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী;
মানস সরোবর পুষ্ট জলধর—
শুভ ঝর সুধাধার সঙ্গে।
শুভ গ্রহ তারা শশাঙ্ক ধারা ঝর ঝর শুভ সতী অঙ্গে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—আশ্রম সম্মুখ।

সত্যবান্।

সত্য। প্রভাতে যে সমস্ত ফল সংগ্রহ ক'রেছিলুম, সাবিত্রী ব্রাহ্মণ ভোজনে সমস্তই নিঃশেষিত ক'রেছে। ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্ট যা কিছু আছে, তাতে বালিকা আজকের মতন কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ ক'রতে পা'রবে। তার পর কা'ল!—কা'লকে না খেতে পেলে সাবিত্রী কেমন ক'রে বাঁচবে! প্রাণময়ী সর্ব্বস্ব আমার, স্বামীর জন্য দেহত্যাগ ক'রতেও কুণ্ঠিতা নয়। উপবাসক্লিষ্টা পতিপরায়ণার যে মুখ দেখে এসেছি, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠেছে! এমন অপূর্ব্ব রত্ন লাভ ক'রে, বনবাসী ভিখারী হ'য়েও আমি মহেশ্বরের ভাগ্যে ভাগ্যবান্। এ রত্ন পেয়ে, অবহেলায় কিনা হারিয়ে ফেল্‌ব! এ দিকে অগ্নিরক্ষার কাষ্ঠের পর্য্যন্ত অভাব। সমস্ত কাষ্ঠ হোমানলে দগ্ধ হ'য়ে গেছে। যাই—বেলা অবসান প্রায়—আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

একি সাবিত্রী, উঠে এলে যে!

সাবিত্রী। বাবা ও মাকে আহার করিয়ে এসেছি।

সত্য। আর তুমি?

সাবিত্রী। আমার এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

সত্য। সে কি সাবিত্রি!

সাবিত্রী। আর যখন তিন দিন কেটে গেল—তখন আর একটু সময়ের জন্য মনে খুঁত রাখ্‌ব কেন?

সত্য। স্বামীর মঙ্গলের জন্য কার্য্য ক'রছ, কিন্তু কার্য্যতঃ বিপরীত ক'রছ সাবিত্রী! তোমার কিছু অমঙ্গল হ'লে কি আমি প্রাণধারণ ক'রব, মনে ক'রেছ!

সাবিত্রী। ভয় নেই, আমি ম'রব না।

সত্য। আর আমাকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ো না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার মঙ্গলের জন্য নয়—আমাকে চিরজীবন যন্ত্রণানলে দগ্ধ করবার জন্য তুমি আমার ঘরে উদয় হ'য়েছ!

সাবিত্রী। ভয় নেই আমি ম'রব না। আপনার শ্রীচরণের শীতল ছায়ায়, যে আশ্রয় পেয়েছে, সে কখনও কি ম'রতে চায়! বিশেষতঃ এখনও আমার শ্বশুর শাশুড়ীর সেবার আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। তাঁরা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তা যা হোক, এমন অসময়ে কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে?

সত্য। অগ্নিহোত্র কার্য্যের জন্য কাষ্ঠের অভাব।

সাবিত্রী। তা হ'লেত নিশ্চয়ই যেতে হবে।—তা হ'লে আমিও সঙ্গে যাব।

সত্য। সে কি!

সাবিত্রী। আজ একলা ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না।

সত্য। সে কি! তুমি ইতিপূর্ব্বে কখনও বনে যাওনি। পথ অতি ক্লেশকর। বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে তুমি কৃশ হয়েছ, সুতরাং পদব্রজে কেমন ক'রে যাবে?

সাবিত্রী। 'কেমন ক'রে যাবে—দেখ্‌তেই পাবে এখন—চল না।

সত্য। এ কি বিপদ! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়।

সাবিত্রী। তা হ'লে আর দেরী কর্‌ছ কেন? একেবারে দুর্গা ব'লে

যাত্রা কর। কুড়ুল আমার কাঁধে দাও। মুখপানে চেয়ে দেখ্‌ছ কি? আমার উপবাস জন্য পরিশ্রম কিম্বা গ্লানি কিছুই নাই। তার ওপর তোমার সঙ্গে যাবার আমার একান্ত ইচ্ছা হয়েছে, সুতরাং আমাকে বাধা দিও না।

সত্য। ভাল, বন-গমনে যদি তোমার একান্তই উৎসাহ হয়ে থাকে, তা হ'লে আমিও তোমার এই প্রিয়কার্য্য ক'র্‌ব। কিন্তু এই দোষ আমাকে স্পর্শ না ক'র্‌তে পারে, এজন্য তুমি জনক-জননীর নিকট অনুমতি গ্রহণ কর।

(দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার প্রবেশ)

দ্যুমৎ। কে কথা কয়?

সাবিত্রী। পিতা, আমি।

দ্যুমৎ। আমি!

শৈব্যা। আপনার পুত্রবধূ।

দ্যুমৎ। আহা মা! এত দুর্ব্বলা হয়েছ যে, তোমার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনেও আমি অনুভব ক'র্‌তে পারিনি। এখানে কি ক'র্‌ছ মা?

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বন-গমন ক'র্‌ছেন।

দ্যুমৎ। এই অপরাহ্ন সময়ে?

সত্য। সমস্ত কাষ্ঠ হোমের জন্য ব্যবহৃত হয়ে গেছে। সমস্ত রাত্রি অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত থাক্‌বে, এমন কাষ্ঠও নাই।

দ্যুমৎ। তা হ'লে অধিক দূর বনে যেন গমন ক'রো না। আজকে রাত্রের মতন যা প্রয়োজন, তাই আন। তার পর কাল প্রাতঃকালে গেলেই চ'ল্‌বে।

সাবিত্রী। পিতা, কন্যার একটা প্রার্থনা আছে।

দ্যুমৎ। প্রার্থনা—কি প্রার্থনা মা! এসে অবধি একদিনের জন্যও কখন কিছু প্রার্থনা ক'রনি। কি প্রার্থনা মা!

শৈব্যা। আর প্রার্থনা ক'র্‌লেই বা দেব কি মা? শুধু আমরা আশীর্ব্বাদ দিতে পারি।

দ্যুমৎ। কি প্রার্থনা মা?

সাবিত্রী। দেখুন পিতৃগৃহ থেকে আসা অবধি প্রায় এক বৎসর আমি আশ্রম থেকে বহির্গতা হই নাই, সুতরাং কুসুমিত কানন দেখ্‌তে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে। পিতা! অনুমতি করুন, স্বামীর সঙ্গে যাই। কেননা, অদ্য ব্রতউদ্‌যাপনের দিন। পতি-বিরহ আমার কোন-মতেই উপযুক্ত নয়।

দ্যুমৎ। রাণী! সাবিত্রী পিতৃগৃহ থেকে এখানে এসে কখন যে কিছু চেয়েছেন, তা ত আমার স্মরণ হয় না।

শৈব্যা। কৈ? আমারও ত স্মরণ হয় না।

দ্যুমৎ। তা' হ'লে কি কর্ত্তব্য?

শৈব্যা। যে নাছোড়বান্দা মেয়ে—ওকি অনুমতি না নিয়ে ছাড়্‌বে। এখনি কত শাস্ত্রের দোহাই দেবে। অত শাস্ত্র বুঝিও না ছাই। কাজেই জবাবও দিতে পারি না।

সাবিত্রী। শাস্ত্রে ব'লেছে—

শৈব্যা। আর শাস্ত্রে কাজ নেই মা। যেতে ইচ্ছা হয়েছে, যাও। শাস্ত্র আবার কি? পতিপরায়ণা সাধ্বী তুমি, তুমি যে বাক্য মুখে উচ্চারণ ক'র্‌বে, তাই শাস্ত্র। মহারাজ বউমাকে অনুমতি দিন।

দ্যুমৎ। মা সাবিত্রী! সন্তুষ্ট মনে অনুমতি ক'র্‌ছি—তুমি স্বামীর অনুগমন কর। চল মহিষী, আর বিলম্ব ক'রো না। আমাকেও পম্পাতীরে নিয়ে চল। সন্ধ্যার সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন।

কাঠুরিয়াগণ।

১ম। আজকে এবনে সমস্ত শুকনো কাঠ নির্ম্মূল ক'রে ফেলা গেছে। কি বলিস্ দাদা ?

২য়। আজকে আর যে কেউ এখানে এসে কাঠের কুঁচিটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন, এমন অবস্থা রাখিনি।

৩য়। না দাদা, অমন কথাটী বলোনা। এবনের গুণ তোমরা কেউ জান না। এ বনে শুক্‌নো কাঠ গজায়।

১ম। বলিস্ কি !

৩য়। আমি স্বচক্ষে দেখিছি দাদা—স্বচক্ষে দেখিছি।—পাহাড়ের তলায় সেই যে একটা অশোক গাছ দেখেছিলি, যেটার ডাল পালা সব শুকিয়ে গিয়েছিল—কতকালের বুড়ো গাছ—মাথায় কেবল একটু শিখের মতন দু'চারটে পাতা। একদিন মনে ক'র্‌লুম—শরীরটে সেদিন ভাই ম্যাজমেজে ছিল—তাইতে মনে ক'র্‌লুম—বেশি দূর আর যাব না, ওই শুক্‌নো গাছ থেকে খানকতক কাঠ কেটে নিয়ে আসি। এই না মনে করেরে ভাই! কুড়ুলটী না কাঁধে ক'রে টুকটুক ক'র্‌তে ক'র্‌তে গাছের কাছে যাচ্ছি!—কাছ বরাবর গেছি!—ওই ওখানে গাছ, আর আমি এখানে!—এমন সময় বল্‌বকি রে ভাই! একটী ফ্যাঁস করে শব্দ হ'ল।

সকলে। সেকিরে! সেকিরে!—শব্দ কি!

৩য়। ভয় নেইরে ভাই—বলি শোন্‌না—ভয়ের কথা হ'লে কি এই বনের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলি! এ দেবতার বন এখানে ভয় কি।

২য়। ভয় নেই—একথা আগে বল্‌তে হয়। তা হ'লে ব্যাপার-খানা কি ভেঙ্গে বল্।

সকলে। আমরা আগাগোড়া শুন্‌বো।

২য়। তার পর আবার একটা ফ্যাঁস।

সকলে। আবার ফ্যাঁস!

৩য়। প্রথম প্রথম মনটায় একটু ভয় হ'ল। এই চেনা যায়গা—দুবেলা যাতায়াত ক'র্‌ছি, এখানে ফ্যাঁস করে কি!—এই না ভেবে রে ভাই! একটু থম্‌কে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় চারিদিক থেকেই ঐ শব্দ—যেদিকে চাই, সেই দিকেই শব্দ।

সকলে। ওই ফ্যাঁস?

৩য়। হাঁ দাদা! ওই ফ্যাঁস—যত সব শুকনো কাঠে ডাল গজাতে লাগল। একটা ক'রে ফ্যাঁস ক'রে শব্দ হয়, আর একটা ক'রে ফ্যাঁকড়া বেরোয়। সে অশোক গাছটায় হ'ল কি জানিসরে ভাই—একেবারে হাড়ে হাড়ে ফুল গজিয়ে গেল।—আমি ত অবাক! তার পর যেদিকে চাই, সেই দিকেই গজায়।

সকলে। বলিস্‌ কি!

১ম। হাঁ হাঁ—এঘটনাটা ঘটেছিল, শুনেছিলুম।

৩য়। সে আজ একবছরের কথা হ'ল।

সকলে। তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্‌?

৩য়। স্বচক্ষে দাদা—স্বচক্ষে।

২য়। তাহ'লে ত বড় আশ্চর্য্যের কথা দাদা!

সকলে। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

৩য়। শুনলুম—একটা বেদের বউ নাকি সেই বনের ভেতরদে যাচ্ছিল। সে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছে।

সকলে। কেন, কেন?—

৩য়। তার মাথায় ছিল তাল পাতার চ্যাঙড়া—তাতে ক'রে সে শুকনো পাতা কুড়ুতে এসেছিল।—দেখতে দেখতে তাতে পাতা বেরুতে সুরু ক'রলে!

দ্বিতীয় দৃশ্য—বন।

কাঠুরিয়াগণ।

১ম। আজকে এবনে সমস্ত শুকনো কাঠ নির্ম্মূল ক'রে ফেলা গেছে। কি বলিস্ দাদা?

২য়। আজকে আর যে কেউ এখানে এসে কাঠের কুচিটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন, এমন অবস্থা রাখিনি।

৩য়। না দাদা, অমন কথাটী বলোনা। এবনের গুণ তোমরা কেউ জান না। এ বনে শুক্‌নো কাঠ গজায়।

১ম। বলিস্ কি!

৩য়। আমি স্বচক্ষে দেখিছি দাদা—স্বচক্ষে দেখিছি।—পাহাড়ের তলায় সেই যে একটা অশোক গাছ দেখেছিলি, যেটার ডাল পালা সব শুকিয়ে গিয়েছিল—কতকালের বুড়ো গাছ—মাথায় কেবল একটু শিখের মতন দু'চারটে পাতা। একদিন মনে ক'র্‌লুম—শরীরটে সেদিন ভাই ম্যাজমেজে ছিল—তাইতে মনে ক'র্‌লুম—বেশি দূর আর যাব না, ওই শুক্‌নো গাছ থেকে খানকতক কাঠ কেটে নিয়ে আসি। এই না মনে করেরে ভাই! কুড়ুলটী না কাঁধে ক'রে টুকটুক ক'র্‌তে ক'র্‌তে গাছের কাছে যাচ্ছি!—কাছ বরাবর গেছি!—ওই ওখানে গাছ, আর আমি এখানে!—এমন সময় বল্‌বকি রে ভাই! একটা ফ্যাঁস করে শব্দ হ'ল।

সকলে। সেকিরে! সেকিরে!—শব্দ কি!

৩য়। ভয় নেইরে ভাই—বলি শোন্‌না—ভয়ের কথা হ'লে কি এই বনের ভেতর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলি! এ দেবতার বন এখানে ভয় কি।

২য়। ভয় নেই—একথা আগে বল্‌তে হয়। তা হ'লে ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বল্।

সকলে। আমরা আগাগোড়া শুন্‌বো।

২য়। তার পর আবার একটা ফ্যাঁস।

সকলে। আবার ফ্যাঁস!

৩য়। প্রথম প্রথম মনটায় একটু ভয় হ'ল। এই চেনা যায়গা—দুবেলা যাতায়াত ক'র্‌ছি, এখানে ফ্যাঁস করে কি!—এই না ভেবে রে ভাই! একটু থম্‌কে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় চারিদিক থেকেই ঐ শব্দ—যেদিকে চাই, সেই দিকেই শব্দ।

সকলে। ওই ফ্যাঁস?

৩য়। হাঁ দাদা! ওই ফ্যাঁস—যত সব শুক্‌নো কাঠে ডাল গজাতে লাগল। একটা ক'রে ফ্যাঁস ক'রে শব্দ হয়, আর একটা ক'রে ফ্যাঁকড়া বেরোয়। সে অশোক গাছটায় হ'ল কি জানিসরে ভাই—একেবারে হাড়ে হাড়ে ফুল গজিয়ে গেল।—আমি ত অবাক! তার পর যেদিকে চাই, সেই দিকেই গজায়।

সকলে। বলিস্‌ কি!

১ম। হাঁ হাঁ—এঘটনাটা ঘটেছিল, শুনেছিলুম।

৩য়। সে আজ একবছরের কথা হ'ল।

সকলে। তুই স্বচক্ষে দেখেছিস্‌?

৩য়। স্বচক্ষে দাদা—স্বচক্ষে।

২য়। তাহ'লে ত বড় আশ্চর্য্যের কথা দাদা!

সকলে। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য!

৩য়। শুনলুম—একটা বেদের বউ নাকি সেই বনের ভেতরদে যাচ্ছিল। সে মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেছে।

সকলে। কেন, কেন?—

৩য়। তার মাথায় ছিল তাল পাতার চ্যাঙড়া—তাতে ক'রে সে শুক্‌নো পাতা কুড়ুতে এসেছিল।—দেখতে দেখতে তাতে পাতা বেরুতে সুরু ক'রলে!

সকলে। তার পর, তার পর ?

৩য়। তার পর—এই এত বড় গুঁড়ি।

সকলে। বউএর মাথায়।

৩য়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই গুঁড়ি বাড়তে লাগিল।—যায় যায় এমন সময় কে কোথা থেকে এসে বউএর চুলের গোছা না ধ'রে তড়াক ক'রে সেই গাছের ওপর উঠে—হাতে দা ছিল, তাই দিয়ে গাছের মাথাটা কেটে ফেল্‌লে। নইলে কাঁদি গজালে বউটো ত একেবারে গেছেলো।

১ম। আর ভাদ্র মাসে সেই বউ-গাছের তলা দে গেলে কি হ'ত !

সকলে। বেম্বরন্ধ ভেদ।

৩য়। তাই বলি এ বনের মর্ম্ম কিছু বোঝা যায় না দাদা, কিছুই বোঝা যায় না—এবনে মানুষ পুত্‌লে গাছ হয়। এই যে বউ আসছে, তা হ'লে কি একটা কাণ্ড ঘটেছে !

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রী। ওগো, তুমি কোথায় গো ?

৩য়। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ !

স্ত্রী। আছ—এখানে আছ গা ?

সকলে। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ ?

স্ত্রী। ওগো ঠাকুরপো ! পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো। আবার তাই !

সকলে। আবার গজান ?

স্ত্রী। এবারে যেমন তেমন গজান নয় গো—যেমন তেমন গজান নয়। শুনলুম—ধনা বাগ্দীর বউ একটা কাঁটাল কাটের পিঁড়ির উপর বসে ভাত খাচ্ছিল। তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই পিঁড়ি—গুঁড়ি ডাল পালা নিয়ে—একেবারে এক বিরোদ্‌ গাছ !

৩য়। ওই শোন ভাই।

সকলে। আর, বউ ?

স্ত্রী। সে এচোঁড় হ'য়ে ঝুলছে গো—এচোঁড় হয়ে ঝুলছে। আহা কাঁচ বউ—সে আর কত বাড়বে—হতুম আমরা, ত একেবারে খাজা কাঁটাল হ'য়ে যেতুম। এমন অদৃষ্ট কি ক'রেছি যে, কাঁটাল-কাটের পিঁড়িতে ব'সে ভাত খাব। চেটাইএর ওপর ব'সে কোন্ দিন কি ছাই তালের আঁটি হ'য়ে যাব। শেষকালে বরাতে কি এই আছে। নাও—কাঠ কাটা রেখে অন্য দেশে যাই চল—এ ভূতের দেশে থাকে না।

সকলে। ও দাদা, ঘাড়ের কাঠ যে খড় খড় করছে !

স্ত্রী। চারিদিকে থেকে যে আবার ফাঁসফ্যাঁসের শব্দ হয়! ওই বুঝি গজালো—ওই বুঝি গজালো!

সকলে। ওই বুঝি গজালো দাদা—হাতে পাতা ঠেকছে !

স্ত্রী। ওরে মিনসে পালিয়ে আয়—ওরে পালিয়ে আয়—শেষ কালে কি গজিয়ে উঠে ফল হয়ে ঝুলবি। কোন্ দিন অন্যমনস্কে পেটে পুরে ফেলব ! পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। কি হ'ল সাবিত্রী ! সমস্ত বন অনুসন্ধান ক'রলুম, তবু ত কোথাও শুকনো কাঠ দেখতে পেলুম না।

সাবিত্রী। তাই ত—বড়ই ত বিস্ময়ের কথা !

সত্য। এতটা পরিশ্রম ক'রে কি শুধু হাতে ফিরতে হবে !

সাবিত্রী। তাও কি হয়,—দেবগুরুর কার্য্য—শুধু হাতে ফেরা কি চলে !

সত্য। তা হ'লে ত দূরবনে প্রবেশ ক'রতে হবে ?

সাবিত্রী। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাই না।

সত্য। কিন্তু সাবিত্রি! এদিকে যে অন্ধকার হয়ে এলো!

সাবিত্রী। বনে প্রবেশ ক'র্‌তে কি ভয় ক'র্‌ছ?

সত্য। রাজ্যহারা হয়ে আছি ব'লে কি, সাবিত্রি! ক্ষত্রিয়ের জীবন পর্য্যন্ত হারিয়ে ব'সে আছি!—ভয় নয়। তবে তুমি সঙ্গে আছ—তার ওপর কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি—সম্মুখে ঘোর অন্ধকার!

সাবিত্রী। তুমি যে আমার সঙ্গে আছ—এটা কি ভুলে গেছ? আমি যে পূর্ণিমার চাঁদ ললাটে বেঁধে চ'লেছি, তা কি তুমি জান না?

সত্য। বেশ, তবে এস—দুর্গা স্মরণ ক'রে এই সম্মুখস্থ গভীর বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

তৃতীয় দৃশ্য—বন।

সত্যবান্‌ ও সাবিত্রী।

সত্য। কি গভীর অন্ধকার! আর ত কিছু দেখা যায় না সাবিত্রী

সাবিত্রী। কেন, আমি ত এখনও বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

সত্য। কই না—কিছু না!—কেমন যেন একটা অন্ধকার! কি হ'ল প্রাণেশ্বরী! সহসা দৃষ্টিশক্তি অবরুদ্ধ হ'ল কেন?

সাবিত্রী। এক দৃষ্টে অবিশ্রাম কাষ্ঠের সন্ধানে প্রতি বৃক্ষ পানে চেয়ে আস্‌ছ, তাই বোধ হয়, চোখে বাধা ঠেক্‌ছে। চোখটা মুছিয়ে দি। এইবারে দেখ দেখি।

সত্য। হাঁ আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি—বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি।—ওই যে সম্মুখের গাছে একটা নীরস শাখা দেখা যাচ্ছে।

সাবিত্রী। বোধ হচ্ছে।

সত্য। বোধ হচ্ছে কেন—ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার পবিত্র

করকমল-স্পর্শে আমার চক্ষু এক নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। তুমি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর, আমি কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে আনি।

সাবিত্রী। কি ব'ল্‌ব?—না ছাড়লে নয়, তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। নইলে কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়্‌তে আমার মন সর্‌ছে না। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাবা ও মা হয় ত এতক্ষণ আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন।

সত্য। যখন দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন আর ভাবনা কি। যাব আর ডাল্‌টা কেটে নিয়ে আস্‌বো।

সাবিত্রী। দেখ স্থান ভাল নয়, সময় ভাল নয়—রাক্ষসী বেলা। একটু সাবধানে পথ চ'লো। আর গাছেই যদি উঠ্‌তে হয়, অতি সাবধানে উঠো। (স্বগত) স্বামীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে আস্‌ছে; যেন ঘন অন্ধকারের পূর্ব্বাভাস সন্ধ্যার ধূসর ছায়া—

সত্য। ভাল সাবিত্রী! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—বহুক্ষণ ধ'রে ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব মনে ক'র্‌ছি, কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকছে ব'লে ব'লতে পার্‌ছি না।

সাবিত্রী। কি ব'ল্‌বে, ব'লেই ফেল না। আমাকে ব'ল্‌বে, তার আবার লজ্জা কি!

সত্য। সমস্ত পথটা তুমি কেবল আমার মুখের দিকে চেয়ে এসেছ।

সাবিত্রী। এই কথা!

সত্য। কথাটা বড় এই নয়। বাড়ীতে তুমি ব'ল্‌লে যে, আমার কানন-শোভা দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে হয়েছে। পথে আস্‌তে আস্‌তে তোমাকে কত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা দেখালুম—পুণ্যজননী নদী দেখালুম, পুষ্পিত তরুলতা দেখালুম, অমন শৈলোত্তম মাল্যবানের সর্ব্বশোভাধার উপত্যকা দেখালুম। সেই অশোক—মাণ্ডব্য-আশ্রম-প্রবেশ-মুখে যার তলদেশে তুমি পথশ্রম-কাতরা হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ

ক'রেছিলে—অপূর্ব্ব ফুলভারে যে তোমার পবিত্র সমাগম আজও পর্য্যন্ত সকলকে জ্ঞাত ক'র্‌ছে—তাও দেখালুম, কিন্তু তুই একটা প্রশ্ন ক'রেই, তোমার উত্তরের ভাবে বুঝ্‌লুম, তুমি কিছুই দেখনি। সমস্ত পথ কেবল আমার মুখের পানে চেয়ে চ'লেছ। কেন বল দেখি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। কেন ?—কি ব'ল্‌ব ?—একদিন বৈশাখের এক নব জলধর একটা চাতকীকে এই রকম একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল। ব'লেছিল—"পৃথিবীতে অনেক নদ নদী, হ্রদ সরোবর, এমন কি স্বচ্ছজলা গিরিপ্রস্রবিনী থাক্‌তে—হাঁ চাতকী! তুমি আমার মুখ পানে চেয়ে থাক কেন ?" চাতকী কি উত্তর দিয়াছিল জানি না। কি ব'লেছিল—তুমি জান কি প্রাণেশ্বর ? তুমি ত সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ—আমি শিষ্যা—আমায় ব'লে দাও না। কেন—কেন ? কি বল্‌ব প্রভু! হতে পারে সমস্তই সুন্দর ; কিন্তু—

অপাং হি তৃপ্তায় ন বারিধারা।
স্বাদুঃ সুগন্ধিঃ স্বদতে তুষারা॥

তোমার রূপ দেখে যে তৃপ্তি লাভ ক'রেছে সে কি আর অন্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়।

সত্য। মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে দিলে সাবিত্রী! ভাল, আগে কাঠ কেটে নিয়ে আসি।—তুমি এই স্থানেই অপেক্ষা কর।

[সত্যবানের প্রস্থান।

সাবিত্রী। দুর্গা দুর্গা! বুক কাঁপ্‌ছে,—প্রাণ কেমন কচ্ছে! সেই কাল সময় উপস্থিত। চক্ষে দেখ্‌লুম—কে যেন কোথা থেকে ঘন ঘোর অন্ধকারের জাল ধীরে ধীরে আমার স্বামীর জীবনের চারিদিকে বেষ্টিত কচ্ছে। কি হবে! ও মা! মঙ্গলচণ্ডী কি হবে মা! দুর্গে শিবে জগজ্জননি ভবানি! তোমার নামস্মরণে শুনেছি সকল ভয় দূর হয় মা!

শুনেছি—স্বামীর মর্য্যাদা-নাশ দেখে, অনিমন্ত্রিতা হয়েও তুমি একদিন পাগলিনীর মত পিতৃগৃহে ছুটে গিছলে। সেখানে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে অসহ্য যন্ত্রণায় মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছিলে। মরণেও সে জ্বালার নিবৃত্তি হয়নি। তাই দেহাবসানে উত্তপ্ত প্রাণের শান্তির সন্ধানে, তুষারে প্রাণ আবৃত ক'র্তে হিমালয়ের ঘরে গিয়ে আত্মরক্ষা ক'রেছিলে। এমন পবিত্রতাময় সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বদেবতাময় পতি আমার বিপন্ন। ঈশানি! এ দাসীর মনের অবস্থা তুমি না বুঝ্লে কে বুঝ্বে মা? এ সঙ্কট-সময়ে তুমি ভিন্ন দাসীকে রক্ষা ক'র্তে আর কে আছে! করাল কাল আমার চখের সাম্নে আমার স্বামীকে গ্রাস ক'র্তে ছুটে আসচে, শক্তিস্বরূপিণী! এ দারুণ সঙ্কটে আমি তোমার শরণাপন্ন হ'লেম। দাসীকে রক্ষা কর—মা, দাসীর মর্য্যাদা রক্ষা কর।

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সাবিত্রী—সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কি প্রভু?

সত্য। কোথায় তুমি?

সাবিত্রী। এই যে প্রভু!

সত্য। আমি যাই—দারুণ শিরঃপীড়া! ধর—আমায় ধর—প্রেমময়ী! শেষ মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে একবার দেখাদাও, আশ্রয় দাও। দেখতে পাচ্চি না—সাধ মেটেনি। সোণার সংসার—বাবা—মা—তুমি। (ভূমিতে পতন। সাবিত্রী কর্ত্তৃক সত্যবানের মস্তক অঙ্কে রক্ষণ) কারে রেখে গেলুম! সাবিত্রী—সাবিত্রী—উঃ!—

সাবিত্রী। আর্য্যপুত্র, হৃদয়-সর্ব্বস্ব, প্রাণেশ্বর!—সব শেষ! দেবর্ষির বাক্য—সেই দিন, সেই বেলা, সেইক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত। সব'শেষ। কি হ'ল! কি হ'ল! কি ক'র্লুম! রাখ্তে পারলুম না—কিছুতেই তোমাকে

রাখ্‌তে পার্‌লুম না। চ'লে গেলে, দাসীকে বনে একা ফেলে চলে গেলে! আর্য্যপুত্র—জীবিতেশ্বর! কথা কও, উঠ। রাজা ও রাণী তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় পথ পানে চেয়ে ব'সে আছেন। তাঁরা যে তোমাকে এক দণ্ড চক্ষের অন্তরাল ক'র্‌তে কাতর হন। মা যে তোমাকে সন্ধ্যা না হ'তেই ঘরে রুদ্ধ ক'রে রাখেন। জেনে শুনে সম্মুখে রাত্রি দেখেও, তুমি এখানে শয়ন ক'র্‌লে কেন? এই দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত। নিশাচরগণ নিষ্ঠুর নিনাদ আরম্ভ ক'রেছে, বন্যজন্তু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ক'র্‌ছে। চতুর্দ্দিকে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনে আমার বুক কাঁপছে। ওগো! ওঠ—ওঠ—জাগো—আমার ভয় দূর কর! আমায় একবার সাবিত্রী ব'লে ডাক! আমাকে নির্জ্জনে পেলে, কত মধুর বাক্যে—কত সোহাগ আদরে—আমার প্রাণে কত যে নূতন সাধ জাগিয়ে তুল্‌তে! আমাকে কত কি চাইতে যে অনুরোধ ক'রতে! আমি না চাইলে যে, বিমর্ষ মুখে ফিরে যেতে! তাই কি আমার পূর্ব্বাচরণের প্রতিশোধ নিচ্ছ? প্রাণেশ্বর! ক্ষমা কর। চরণাশ্রিতা দাসী কাতর প্রাণে তোমায় অনুরোধ ক'রছে, আজ একটী বার আমাকে সাবিত্রী ব'লে ডাক।

(গীত)

অন্ধের নয়ন তুমি এ কথা কি নাই মনে।
তাই কি হে যোগীবর আছ চলে যোগাসনে॥
ভুলেছ কি একেবারে তোমারে ক্ষণ না হেরে,
আকুলা জননী তব আঁধার হেরে নয়নে।
এস নাথ এস ফিরে, ভুলনা হে অধিনীরে,
গলহার দামিনীরে কভু কি ছাড়েহে ঘনে॥

ওগো! আমার শোন্‌বার সাধ যে কিছুই মেটেনি। প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! অপূর্ণ সাধে আমাকে অনাথিনী ক'রে যেয়ো না। তবু শুন্‌ছো না—তবু ফি'রছো না! হে জনার্দ্দন! স্বামিকে আমার ফিরিয়ে দাও!

আজীবন তপস্যায় তোমাতে আত্মসমর্পণ ক'রে এতকাল স্বামী আমার, তোমারই সেবা ক'রে এসেছেন। তাঁকে এ অকাল-মৃত্যু দিও না। রক্ষা কর—ফিরিয়ে দাও। হে জনার্দ্দন! হে শঙ্কর! হে ধর্ম্ম! এসঙ্কটে আমি তোমাদের আশ্রয় ভিক্ষা করি, আশ্রয় দাও—অনাথিনীকে আশ্রয় দাও।

(যমের প্রবেশ)

একি! রক্তবস্ত্র-পরিধায়ী, বদ্ধমুকুট, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, শ্যাম গৌরবর্ণ, লোহিত-লোচন কে ইনি মহাপুরুষ পাশ-হস্তে আমার স্বামীকে নিরীক্ষণ ক'রতে ক'রতে আগমন ক'রছেন। ভয়ে সর্ব্ব শরীর কাঁপছে। মা শক্তি-রূপা সনাতনি! শক্তি দাও—সাহস দাও। (যমের প্রতি) বোধ হচ্ছে, আপনি কোন দেবতা। কেন না, আপনার শরীর অলৌকিক। হে দেব, যদি ইচ্ছা হয়, বলুন—আপনি কে এবং কি নিমিত্তই বা হেথা আগমন ক'রেছেন।

যম। সাবিত্রী! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠান-সমন্বিতা, এই জন্য তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ ক'রছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়েছে, তাই তাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।

সাবিত্রী। ভগবন্! শুনতে পাই—আপনার দূতেরাই মানুষকে নিতে আসে, তা ঠাকুর! আপনি এসেছেন কেন?

যম। সত্যবান্ ধর্ম্মাত্মা, রূপবান্ ও গুণসাগর। এরূপ লোককে নিয়ে যেতে আমি নিজেই আসি। তার ওপর তুমি তাকে স্পর্শ ক'রে র'য়েছ। এইজন্য আমি নিজেই এসেছি।

সাবিত্রী। দয়াময়! যদি দাসীকে কৃপা ক'রে দেখা দিয়েছেন, তা হ'লে আপনার কৃপা অসম্পূর্ণ রাখবেন না। আপনার নিকটে আমি স্বামীর জীবন ভিক্ষা করি।

(গীত।)

দয়া ক'রে দেছ দেখা সে দয়া নিয়োনা তুলে।
অধিনী হৃদয়-মণি ভিক্ষা চায় পদমূলে ॥
সকল সংসার ঘুরে, এসে কানন ভিতরে,
পেয়েছি হৃদয় ভরে হৃদয় রতন :
দিওনা হে ডুবাইয়ে সে মণি অতল জলে ॥

যম। তা যে হ'তে পারে না সাবিত্রী! মৃত কখনও ত পুনর্জ্জীবিত হয় না।

সাবিত্রী। ধর্ম্মের করুণায় কি না হ'তে পারে দয়াময়?

যম। এ নিয়তির ক্রিয়া করুণার কথা নয় বালিকা! তুমি সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ কর। আমি তার প্রাণ গ্রহণ করি।

সাবিত্রী। আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, জীবন—সমস্ত গ্রহণ করুন্।

যম। তোমার ধর্ম্ম তোমারই সহায়—জীবন-পথে তোমারই সহচর, অপরে তার ফলভাগী হতে পারে না। যাও সত্যবানের জীবনের মমতা পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আর আমার ঘর কোথায়?—আপনি আমার ঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন! আবার ব'লছি—প্রভু! দেবতা! ধর্ম্ম! দয়া করুন—আমাকে অকালে পতিহীনা ক'র্‌বেন না।

যম। অন্যায় উপরোধ ক'রো না সাবিত্রী! স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। কেমন ক'রে ফিরব? বৃদ্ধ অন্ধ বনবাসী রাজার যষ্টি নিয়ে বনে এসেছি—আশাপথ চেয়ে অন্ধ ব'সে আছেন। একা সেখানে কেমন ক'রে ফির্‌বো! প্রতি পদশব্দে রাজর্ষি আমার স্বামীর আগমন প্রশ্ন ক'র্‌ছেন, সেখানে একা কেমন ক'রে ফিরবো! আমায় যখন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বেন—সাবিত্রী! কই—কই আমার জীবন কই? অন্ধের

সর্ব্বস্ব ধন—আমার চক্ষুরত্ন—আমার সত্যবান্ কই ? ধর্ম্মরাজ ! তুমিই আমায় শিখিয়ে দাও—আমি কি ব'লব ? কোন্ প্রাণে ব'লব যে, মহারাজ ! তোমার পুত্রকে আমি যমের হাতে সমর্পণ ক'রে এসেছি ! ধর্ম্মরাজ ! চরণে ধরি—ভিক্ষা দাও। আমাকে দয়া প্রকাশ ক'রতে যদি আপনি অশক্ত, বৃদ্ধ পরম ধার্ম্মিক রাজার প্রতি কৃপা করুন। এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে পুত্র-বিয়োগী করবেন না। তাঁর কেউ নেই—কিছু নেই—চক্ষুরত্ন, তাও নেই। দয়া করুন। আবার ভিক্ষা ক'রছি, স্বামীর জন্য নিজের জীবন প্রদান ক'রছি—ক্রীতদাসী হ'তে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি। স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও।

যম। সাবিত্রী ! অন্যায় উপরোধে আমার সময় নষ্ট ক'রো না। এই দণ্ডেই স্বামীকে পরিত্যাগ কর। আমি সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করি। আমি বিধির আদেশ পালন ক'রতে এসেছি। বিধি-লিপির খণ্ডন নেই।

সাবিত্রী। বেশ তবে গ্রহণ করুন ! (সত্যবানের মস্তক ভূতলে রক্ষা, সাবিত্রী দণ্ডায়মানা, যম কর্ত্তৃক সত্যবানের বক্ষে হস্তক্ষেপ, প্রাণ গ্রহণের অভিনয় ও গমনোদ্যোগ এবং সাবিত্রীর পশ্চাদনুসরণ)

যম। তুমি আর আমার সঙ্গে আস্‌ছ কেন ? প্রতিনিবৃত্তা হও, সত্যবানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন কর। যতদূর পর্য্যন্ত তোমার আসা সম্ভব, তুমি ততদূর এসেছ। যাও—স্বামীর নিকটে তোমার কোনও ঋণ নাই।

সাবিত্রী। জীবনে মরণে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। যেহেতু এই হ'চ্ছে সনাতন ধর্ম্ম।

যম। আমার সঙ্গে যাওয়া ত তোমার সম্ভব নয়।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যখন যাচ্ছেন, তখন আমিই বা যেতে পারব না কেন ?

যম। তোমার স্বামী সূক্ষ্ম দেহে পাশবদ্ধ হয়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। ঐ দেখ—তাঁর স্থূল দেহ—পক্ষি-হীন পিঞ্জরের ন্যায়—ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প'ড়ে আছে। দেহীর এ পথে গমন অসম্ভব। ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যেথায় যাচ্ছেন, আপনিও যেখানে যাচ্ছেন, আমারও সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য যে হেতু এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম্ম। তপস্যা, গুরুভক্তি, পতিস্নেহ ব্রত ও আপনার প্রসাদ দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হোক। অন্য কোন দেবতা হ'লে আমার গমনে বাধা দিলেও দিতে পার্‌তেন, কিন্তু আপনি পারেন না।

যম। আমি পারিনা! এ তুমি কি ব'লছ?

সাবিত্রী। আমি ঠিকই ব'ল্‌ছি, শাস্ত্র যা বলে,—তাই ব'ল্‌ছি। আপনি পারেন না। আর সেইজন্য কার্য্যতঃ অপর কেউও পারেন না। অর্থাৎ আমি যদি ইচ্ছা না করি, তেত্রিশ কোটী দেবতা একত্র হয়েও আমার গতিরোধ ক'র্‌তে পারেন না।

যম। ক্ষুদ্র বালিকা! এ তুমি কি বল্‌ছ।

সাবিত্রী। আপনি যেমন আমার প্রিয়তম বস্তুটীকে পাশে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, আমিও তদ্রূপ আপনাকে কঠিন পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি।—কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন ক'র্‌বার জন্য আমার স্বামী যে সমস্ত ধর্ম্মাচরণ ক'র্‌ছেন, আর তাঁর সহধর্ম্মিনী হ'য়ে আমার আয়তি রক্ষার জন্য আমিও যে সমস্ত কার্য্য ক'রেছি তাতে আপনার এ রজ্জু সম্পূর্ণ ছিন্ন না হোক্, বহুস্থানে দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমি যে পাশে আপনাকে আবদ্ধ রেখেছি, ধর্ম্মরাজ, তা আজও পর্য্যন্ত অটুট। তবে শুনুন।—তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন,—সপ্তপদ মাত্র ভূমি একত্র সঞ্চরণ ক'র্‌লেই মিত্রতা হয়। আমিও আপনার সঙ্গে সাত পা চ'লেছি। অতএব মিত্রতাকে অগ্রবর্ত্তিনী ক'রে আমি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ ক'র্‌ব, আপনি স্থির হ'য়ে শুনুন।

যম। এ কি!—এক কথায় আমার গতি রুদ্ধ!—শক্তিময়ী—এ তেজস্বিনী কে?

সাবিত্রী। দেখুন, সাধুরা সর্ব্বদেবতার মধ্যে ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান ক'রেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও ধর্ম্মহীন হ'লে, নিজ নিজ আসন হ'তে বিচ্যুত হন। শাস্ত্রের বচন—যেখানে ধর্ম্ম, সেখানে জয়। ধর্ম্মের সঙ্গে জয়ের নিত্য সম্বন্ধ। বৃত্রাদি অসুরগণও ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে স্বর্গ পর্য্যন্ত জয় ক'র্‌তে সমর্থ হ'য়েছিলেন। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—সর্ব্বনিয়ন্তা—সেই নারায়ণকেও একমাত্র ধর্ম্মবলে দৈত্যরাজ বলি, নিজ অট্টালিকার দ্বারদেশে দ্বারীরূপে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সুতরাং ধর্ম্মই একমাত্র বলবান্। এদিকে আবার সংসারীর ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। অবশ্য—ধর্ম্ম না হ'লে চিরব্রহ্মচর্য্যও হয় না, সন্ন্যাসও হয় না। কিন্তু অতি জিতেন্দ্রিয় না হ'লে সংসারধর্ম্ম করা যায় না। সংসারে এত বাধা—এত প্রলোভন! এইজন্য ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে জনকরাজর্ষির শ্রেষ্ঠ স্থান। ধার্ম্মিক গৃহস্থের আশ্রম—ঋষি তপস্বিগণের তীর্থ। আমি সেই গৃহস্থাশ্রমের সন্ন্যাসিনী। আপনি দণ্ডায়মান হ'ন।

যম। (স্বগত) একি! এযে আমি ক্রমেই শক্তিহীন হ'য়ে প'ড়্‌ছি! আমার সর্ব্বশরীর যে কম্পিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। কি ক'রে এ বালিকার হাত থেকে নিস্তার পাই! প্রলোভন দেখান ভিন্ন দে'খ্‌ছি অন্য উপায় নাই। (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী! তোমার যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি পরম পরিতুষ্ট হ'য়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর—আমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমাকে আর যে কোনও বর দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী! আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত ও অন্ধ হয়ে আছেন। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে তিনি নয়ন লাভ করুন।

যম। তথাস্তু। যাও এইবারে ফিরে যাও। একি—তথাপি অনুসরণ ক'র্‌ছ যে! বর দান ক'র্‌লুম, আবার কেন?

সাবিত্রী। স্বামীর যে গতি, আমারও তাই। আপনি যেখানে ওঁকে নিয়ে যাবেন আমিও সেইখানে যাব। সম্প্রতি যেতে যেতে আমার আর একটা কথা শুনুন। পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন, যে সাধুদের সঙ্গে একবার মাত্র সঙ্গ হওয়াও প্রার্থনীয়, তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা—তার তুল্য বাঞ্ছনীয় বিষয় ত জগতে আর নেই। সৎপুরুষদের সমাগম কখনও নিষ্ফল হয় না।

যম। এ তুমি কি ব'লছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আপনি আবার সাধুতার প্রতিমূর্ত্তি—সুতরাং নিষ্পাপ। আপনার সংসর্গে বাস করাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং আমি যদি কোন ফল পাই, তা কেবল শাস্ত্রের আদেশে।

যম। সাবিত্রী! তোমার ইষ্টসাধনবিষয়িণী বাণী আমাকে আজ যথেষ্ট জ্ঞান দান ক'র্‌লে। এরূপ তেজোময় বাক্য আমি আর কখনও শুনিনি। হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ! মা সত্বর এ আনন্দের ফলভোগ কর। সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে, তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর যেন আবার নিজের রাজ্যলাভ করেন, আর তিনি যেন স্বধর্ম্ম হ'তে পরিভ্রষ্ট না হন।

যম। তথাস্তু। এইবারে যাও মা, তোমার ত কামনা পূর্ণ ক'রে দিলুম।

সাবিত্রী। তা দিয়েছেন—এবং এই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, এবং হৃদয়ের আনন্দে মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়েছে, আপনাকে নিবেদন করি, শুনুন—যেহেতু আত্মতৃপ্তি দেবতাকে নিবেদন ক'র্‌তে হয়। আপনি যে কার্য্যই করুন না কেন, চিরদিন নিয়মের বশীভূত হ'য়ে করেন,—নিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক করেন না। এইজন্যই আপনার নাম যম। সর্ব্বভূতে ভালবাসা, অনুগ্রহ ও দান—ইহাই সাধুদিগের সনাতন

ধর্ম্ম। মানুষে শক্তি অনুসারে কোমল হয়, সৎপুরুষেরা শত্রুকেও দয়া করেন।—সুতরাং আপনার দয়া—এ নূতন কথা নয়।

যম। তৃষ্ণার্ত্ত লোকের পক্ষে জল যেমন, আমার পক্ষে তোমার মধুর অথচ জ্ঞানপূর্ণ কথাও সেই রকম বোধ হচ্ছে। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার পিতা রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন আছেন। অতএব কুলোজ্জ্বলকর, তাঁর একশত পুত্র হউক—এই তৃতীয় বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি।

যম। তথাস্তু—তোমার পিতার কুলসন্তানকারী তেজস্বী একশত পুত্র হোক্। আর নয়—তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে, এই বার ফিরে যাও।

সাবিত্রী। স্বামীর সঙ্গে থাকায় এ আমার দূর ব'লে বোধ হচ্ছে না। বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। সৎপুরুষের প্রতি লোকে যত বিশ্বাস করে, নিজের আত্মার প্রতিও তত করে না। এই জন্য লোকে সৎ-পুরুষের প্রণয় প্রার্থনা করেন—আপনিও সৎপুরুষ। তার ওপর বহুক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, আপনিও ক'রেছেন! সুতরাং শাস্ত্রাদেশে আপনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই আমার অনিচ্ছায় আপনি আমাকে নিবৃত্তা ক'রতে পারেন না।

যম। না,—দেখ্‌ছি এ বালিকার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন কথা। একে নিরস্ত করি আমার এমন শক্তি নাই। অবলা—তীব্র দৃষ্টির আঘাত সহ্য ক'রতে অসমর্থ—সে কিনা যুক্তিতর্কে, জ্ঞানে, মধুর বচন-বিন্যাসে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ক'রলে! এই অবলার কথায় আমাকে পরিচালিত হতে হচ্ছে!—এযে ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি বালিকা যেন নিঃশেষে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছে,—আমি জ্ঞানশূন্য! বাহিরে স্থিরা, শান্তিময়ী, নতমুখী—

কিন্তু বাক্যে বিশ্ববিমোহিনীর ভুবন-বশীকরণের শক্তি! কে এ তেজস্বিনী? সাবিত্রী! এই শেষ বক্তব্য—তোমার প্রতি স্নেহে আমি আরও এক বর প্রদান ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। সুতরাং সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি চতুর্থ বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। বেশ, এতই যদি ভাগ্যবতী আমি, যে আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত জ্ঞানে, আপনি আমাকে স্বেচ্ছায় বর প্রদানে উদ্যত হয়েছেন, তবে এই প্রার্থনা করি—যেন মর্ত্তে এসে আমি নিষ্ফলা নামে জগতে পরিচিতা না হই। কেননা, গৃহস্থ-কন্যা নিষ্ফলা—এ হ'তে বুঝি অপবাদ আর নাই!

যম। বেশ, এই কথা! তা হ'লে যদি আমি তোমাকে শত পুত্রের বর দান করি, তা হ'লে ত আমাকে নিষ্কৃতি দাও?

সাবিত্রী। তদ্দণ্ডেই।

যম। সাবিত্রী, তুমি সূর্য্যসদৃশ, তেজস্বী শত পুত্র লাভ কর।

সাবিত্রী। আপনি পুনরায় আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)

যম। তোমার মঙ্গল হোক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—বনপথ।

(মাণ্ডব্য ও সনাতনের প্রবেশ)।

সনা। বৃথা অন্বেষণ,—এত বন ঘুরেও যখন সন্ধান পেলুম না, তখন আর কি তাদের পাব ?

মাণ্ডব্য। পাব না—সেকি সনাতন! পাব না কি! আজই যে আমি যুবকদম্পতীর মাথায় শান্তিজল ঢেলেছি—সাবিত্রীকে অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ প্রদান ক'রেছি, তার ফল কি এই হ'ল! আশীর্ব্বাদের পর মুহূর্ত্তেই, কিনা বৃদ্ধ রাজা ও রাণীর সর্ব্বনাশ হবে! পাব না—কি ব'ল্‌ছ সনাতন—পাব না কি! যদি ধরণী নিজ বক্ষে লুকিয়ে রাখে, ধরণী-বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে তাদের খুঁজে আনব। সাগর যদি গ্রাস করে, অগস্ত্যের ন্যায় গণ্ডূষে সাগর উদরগত ক'র্‌ব। যম কর্ত্তৃক যদি অকালে নিষ্পীড়িত হয়, যম মন্দির চূর্ণ ক'র্‌বো—আর না যাতে লোককে যমভবন যেতে হয়, তার ব্যবস্থা ক'র্‌ব। পাব না!—পাব না কি!

সনা। প্রভু শুধু না ফির্‌তে হয়, তার উপায় করুন। অন্ধ রাজা ও বৃদ্ধা রাণী যখন আমাদের প্রত্যাগমন-বার্ত্তা শুনে, ছুটে এসে জিজ্ঞাসা ক'রবে—সনাতন আমার পুত্র ও পুত্রবধূ? পিতা! তাদের কেমন করে বল্‌ব যে, রিক্তহস্তে ফিরে এসেছি।

মাণ্ডব্য। সাবিত্রী সত্যবান্‌কে না নিয়ে ফির্‌ব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। প্রয়োজন হয়, যম-ভবনে প্রবেশ ক'র্‌ব। একবার নিজের জন্য প্রবেশ ক'রেছিলুম—নিরপরাধে শূলদণ্ড বিধান ক'রেছিল ব'লে, আমিও তাকে দাসীপুত্র হবার শাপ দিয়েছিলুম। আমি আবার সাবিত্রীর অবৈধব্যের জন্য প্রবেশ করব।

সনা। পিতা—পিতা!

মাণ্ডব্য। কি সনাতন?

সনা। আর নয়—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। সব শেষ!

মাণ্ডব্য। সব শেষ?

সনা। সখার প্রাণহীন দেহ-ধূলি-বিলুণ্ঠিত!

মাণ্ডব্য। হুঁ!——আর সাবিত্রী?

সনাতন। তাঁকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না প্রভু! বুঝি অভাগিনী স্বামীবিয়োগে উন্মাদিনী হয়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে! সখা! সখা! কি ক'র্‌লে! কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে!

মাণ্ডব্য। সনাতন! ঋষিকুমার হয়ে এ তুমি কি অম্ভোচিত কার্য্য ক'র্‌ছ? ঋষিগণ শোক ক'র্‌বার জন্য জন্মগ্রহণ করেনি। এস আমরা সাবিত্রীর অনুসন্ধান করি। সাবিত্রী কই? সতীরাণী, নিজের অবৈধব্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে, তিন দিনের নিরম্বু উপবাসের ব্রত উদ্‌যাপন করেছে। সে সাবিত্রী কই? পিঞ্জর পড়ে আছে, নিশ্চয় সে তেজস্বিনী এ পিঞ্জরের পাখীকে ফিরিয়ে আন্‌তে, ভীষণ ব্যাধের অনুসরণ ক'রেছে। সাবিত্রী—সাবিত্রী—মা আমার! কোথায় তুমি?—কতদূরে? মা, মা, সন্তান আমি—এ অপূর্ব্ব জীবন প্রতিষ্ঠা দেখ্‌বার আমার বড় সাধ হয়েছে। দেখাদাও।—চিরদিন যে মৃত-সঞ্জীবনী সুধার সন্ধানে উন্মত্তের মত ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিছি, সেই সুধাভাণ্ড, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নাধার সতীর হৃদয়—আমাকে একবার দেখাও।

সনা। পিতা! সত্যবানের দেহ সম্বন্ধে কি ক'র্‌ব, আদেশ করুন।

মাণ্ডব্য। আমি দেহ রক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি। দেহের চতুর্দ্দিকে গণ্ডী দিচ্চি। ভূত প্রেত পিশাচ রাক্ষসাদি পিশিতাশী জীব দূর হও, সত্যবানের প্রাণহীন দেহ-সমীপে কেউ এসোনা। সাবধান, এই গণ্ডীস্পর্শ মাত্রেই সকলে চক্ষুর নিমেষে ভস্মীভূত হবে।

ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—আশ্রম সম্মুখ।

শৈব্যা ও দ্যুমৎসেন।

দ্যুমৎ। কি ক'র্‌লুম শৈব্যা! কেন অসময়ে পুত্রকে বনে পাঠালুম! রাজ্য গেছে, চক্ষু গেছে, অন্ধের যষ্টি পুত্ররত্ন অবশিষ্ট ছিল, তাও গেল! ও শৈব্যা! কি ক'র্‌লুম, কেন অসময়ে তাকে বনে যেতে আদেশ ক'র্‌লুম। তুচ্ছ কাঠ—একরাত্রের জন্য ঋষিদের ঘর থেকে ভিক্ষা ক'রে আন্‌লুম না কেন?

শৈব্যা। মহারাজ, উতলা হবেন না। আপনি উতলা হ'লে এ অভাগিনীর উপায় কি—আমি যে দশদিক অন্ধকার দেখছি।

দ্যুমৎ। আর অন্ধকার—আমি চক্ষুহীন হয়েও দেখ্‌বার সমস্ত সুখ অনুভব ক'রেছি।—ভগবান যে এ অন্ধ বৃদ্ধকে সাবিত্রী সত্যবানরূপ দুটী প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রদান ক'রেছিলেন। আমি দু'জনের মাথায় হাত দিলেই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ সৌন্দর্য্যে যে আমার দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হ'ত! রাণী, ইচ্ছা করে সেই তারকাযুগল স্বহস্তে উৎপাটিত ক'রে বনে নিক্ষেপ ক'রলুম! না না—ওই আস্‌ছে। ওই যে কার পদ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি না? কেও—কেও—সত্যবান্ এলি!

শৈব্যা। কেও—সাবিত্রী আমার আস্‌ছ?

(অলিক্ষরার প্রবেশ।)

অলি। না, মা—আমি অলিক্ষরা।

শৈব্যা। কি ক'রলুম মা অলিক্ষরা!—আমি যে হাস্‌তে হাস্‌তে আনন্দময়ীকে স্বামীর অনুগমন ক'রতে অনুমতি ক'রেছি। পম্পা সরো-

বরের তীর ধ'রে, আমার হর গৌরী যে, সমস্ত বন আলো ক'রতে ক'রতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষু অন্ধ ক'রে মিলিয়ে গেছে! এ চক্ষু কি আর মিলবে না অলিক্ষরা?

দ্যুমৎ। যা ঘটেছে, আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—সব দিব্য চক্ষে দেখ্‌তি পাচ্ছি। মা আমার চারদিন উপবাসিনী—অর্দ্ধমৃতা! সতী মনের উৎসাহে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বল দেহ, পরিশ্রমের ভার সহ্য ক'রতে পারেনি। দেখ্‌তে পাচ্ছি—রাণী রাণী, ঠিক দেখ্‌তে পাচ্ছি চোখের সামনে, সে সোণার লতা কঠিন বনপথে ধূলাবলুণ্ঠিতা। মা আমার স্বামীর পায়ে মাথা রেখে স্বর্গে চলে গেছেন।

অলি। স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই যদি সাবিত্রীর মৃত্যু হয়, তা হ'লে মহারাজ, তার তুল্য ভাগ্যবতী আর কে আছে? এমন দেবতারও বাঞ্ছনীয় তীর্থ-মৃত্যু যার, তার জন্য আর দুঃখ কি? পুত্র আপনার সুস্থ শরীরে ফিরে আসুন—এই আমাদের একমাত্র কামনা।

দ্যুমৎ। অলিক্ষরা, সত্যবান আমার সাবিত্রী বিহনে বেঁচে আছে—এটা কি বিশ্বাস কর?—মাধবী শুকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সহকারও শুকিয়েছে,—আমার সাধের বাগান আবার যে মরুভূমি, সেই মরুভূমিতেই পরিণত হয়েছে।

অলি। আমার পিতা ও স্বামী তাঁদের অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ ক'রেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁরা ফিরে আসেন, আমার অনুরোধ—অন্ততঃ ততক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করুন।

শৈব্যা। তোমরাই এতকাল অন্ধরাজাকে রক্ষা ক'রে এসেছ। তোমরা এখন এ বিপদে তাঁকে রক্ষা না ক'রলে, কে ক'রবে মা!

দ্যুমৎ। অন্ধ হয়ে, রাজ্যহারা হয়ে, বালবৎসা স্ত্রী নিয়ে তোমার পিতার আশ্রমে এসেছিলুম। নিজ তপস্যার আশ্রয়ে স্থান দিয়ে, তিনি আমাকে সন্ন্যাসী ক'রেছিলেন। তুমি আবার কোথা থেকে এক সোণার

প্রতিমা এনে আমার পুত্রকে উপহার দিয়ে, আমাকে ভবিষ্যতের এক অপূর্ব্ব ছবি দেখিয়ে, এই বৃদ্ধ বয়সে আবার সংসারী ক'রেছ। সে অপূর্ব্ব ছবি যে, দূর থেকেই মিলিয়ে যায় মা!

অলি। ভয় নেই মহারাজ!—আমার মন নিরাতঙ্ক।

শৈব্যা। দাও মা সতী লক্ষ্মী,—অভয় দাও মা,—অভয় দাও।

অলি। সাবিত্রীর ত্রিরাত্র ব্রত—আমার পিতা আবার সে যজ্ঞের হোতা—সাধুত্তম ঋষিগণও পিতার সঙ্গে এ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন। যজ্ঞ নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হয়েছে। ঋষিগণ আপনাদের পুত্রবধূকে অবৈধব্য আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন। এমন শুভদিনে কখনও কি অমঙ্গল হ'তে পারে? যমবিজয়ী পিতা—তাঁর আশীর্ব্বাদ—সে আশীর্ব্বাদ নিস্ফল হবে? তা আবার কিনা—যে দিনে ব্রত উদ্‌যাপন, সেই দিনে! আমরা সাত এয়োতে পিতার আজ্ঞায় সাবিত্রীর মাথায় জল ঢেলেছি। তোমার পুত্র-বধূর কেশকলাপ এখনও যে, সে জলে সিক্ত হয়ে আছে মহারাজ! যম এসে কিনা সেই সিক্ত কেশে হস্তার্পণ ক'র্‌বে!

(ঋষিগণের প্রবেশ।)

শৈব্যা। মহারাজ, ঠাকুরেরা সব এখানে আস্‌ছেন।

দ্যুমৎ। ঠাকুর, রাজ্যচ্যুত অন্ধ ভৃত্যকে এতকাল শ্রীচরণের আশ্রয়ে রেখে এসেছেন, আজকে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আশ্রয়চ্যুত কর্‌বেন না।

সকলে। ভয় কি—ভয় কি!

১ম ঋষি। তোমার পুত্র পুত্রবধূর কোন অমঙ্গল হবে না মহারাজ!

সকলে। এ আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

১ম ঋষি। এই আমরা সবাই মিলে অগ্নিতে আহুতি ঢেলে, তোমার পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এলুম—

২য় ঋষি। অগ্নি অমনি প্রত্যক্ষবৎ লহ লহ জিহ্বা বা'র ক'রে, সেই সমস্ত ঘৃত পান কর্‌লে—

৩য় ঋষি কাষ্ঠখণ্ড সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে অঙ্গারবৎ হয়ে গেল—

১ম ঋষি। প্রশান্ত দিঙ্‌মণ্ডল মৃগ-পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল।

২য় ঋষি। বৃক্ষলতার পত্র সমস্ত সর্‌ সর্‌ শব্দে দিগন্ত মধুময় ক'রে তুললে—

৩য় ঋষি। আর লাজগুচ্ছের ন্যায়—কুন্দ, মালতী, শেফালিকা, মধুপবনে আন্দোলিত হয়ে, ঝর্‌ ঝর্‌ ঝ'রে গেল—

১ম ঋষি। এমন সময়ে আপনার পুত্র—পুত্রবধূর অমঙ্গল হবে!

সকলে। কখনই নয়—কোন প্রকারে নয়।

২য় ঋষি। বোধ হয়, পতি-পরায়ণা পতি সঙ্গে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কথঞ্চিৎ ক্লান্তা হয়েছেন।

৩য় ঋষি। অথবা ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে বহুদূরগতা হয়ে, পথ হারিয়েছেন।

১ম ঋষি। তাই রাত্রের জন্য, হয় ত উভয়ে বনমধ্যে কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন।

সকলে। মহারাজ, ভয় ক'র্‌বেন না।

১ম ঋষি। অলিক্ষরে, তোমার পিতা কোথায়?

অলি। তিনি রাজকুমারের অনুসন্ধানে গমন ক'রেছেন।

সকলে। তবে আর কি!—যমবিজয়ী মাণ্ডব্য যখন অনুসন্ধানে গেছেন, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। আমরাও সকলে অনুসন্ধানে যাচ্ছি।

সকলে। অবশ্য—অবশ্য।

২য়। অনুসন্ধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যদি যম-ভবনে গমন কর্‌তে হয়, আমরা তাতেও প্রস্তুত আছি।

৩য়। চল, চল—আর বিলম্বে প্রয়োজন না।

অলি। আসুন মহারাজ,—আমরাও এই সবমহাপুরুষদের অনুগমন করি।

হ্যামৎ। একি হ'ল—একি হ'ল!—দয়াময়, দয়াময়—এ আমার কি হ'ল!

সকলে। কি হ'ল—কি হ'ল মহারাজ!

হ্যামৎ। সহসা আমার দৃষ্টিশক্তি কে ফিরিয়ে দিলে? আমি আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি—সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—এই আপনাদের চরণ দর্শন কর্‌ছি।

শৈব্যা। মহারাজ, মহারাজ! এ আপনি কি ব'লছেন।

ঋষিগণ। অপূর্ব্ব দৈবশক্তি!

অলি। সতী—সতী—মহারাজ, সতী আপনার গৃহে অবতীর্ণা—ত্রিরাত্র-ব্রতে উপবাসিনী সতী আপনার গৃহে শান্তিময়ীরূপে অবস্থিতা। মহারাজ—আপনাকে দর্শন ক'র্‌লে ভয় দূরে পলায়ন ক'র্‌বে। সেখানে কিনা আপনার ভয়।

হ্যামৎ। কি সুন্দর! চারিদিক কি সুন্দর! রাণী! এই তুমি! অলিক্ষরা! এই তুমি—এই তুমি—আহা তুমি এই অলিক্ষরা! দয়াময়! এই চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। এই আপনাদের দেববাঞ্ছিত মূর্ত্তি। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে মনোমোহিনী প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখে দেখেও আমি তৃপ্তি পাইনি, এই সেই শৈব্যা রাণীর ছায়া। যে অলিক্ষরার মিষ্ট বাক্য কর্ণে প্রবেশ ক'রে, আমার হৃদয়ে এক মধুময় রূপের আভাস দেখাত, এই সেই আরও সুন্দর—কত সুন্দর এক মুখে বল্‌তে পাচ্ছি না—কত সুন্দর অলিক্ষরা।

অলি। আর আপনার পুত্রবধূ! শত অলিক্ষরার একত্র সমাবেশে সে সর্ব্বনাশার রূপের একাংশ প্রস্তুত হয়। মহারাজ! চক্ষু পেয়েছেন। যৌবনে আপনার পুত্র কত সুন্দর হয়েছে দর্শন ক'রবেন চলুন। আর তার পাশে শোভাময়ী ভুবনমোহিনী সাবিত্রী—মহারাজ, হরগৌরী—হরগৌরী!

শৈব্যা। ঠাকুর? স্বামীকে চক্ষু দিয়েছেন এখন তাঁকে চক্ষের তারা দিন। দেখ্‌বেন দয়াময়! যেন স্বামীর আমার হর্ষে বিষাদ না হয়!

সকলে। কখনই নয়। শুভলক্ষণ—দৈবশক্তি!

অলি। সতী—সতী—

সকলে। এস মহারাজ, চক্ষু পেয়েছ, আর কেন? এস সকলে সন্ধান করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

যম ও তৎপশ্চাৎ কিঞ্চিৎ দূরে সাবিত্রী।

যম। সে সর্ব্বনাশীর হাত থেকে যে নিস্তার পাব, এ আমার বিশ্বাস ছিল না। বাপ্‌—কি বিপদেই পড়েছিলুম!—আর একটু পীড়ন কর-লেই সত্যবানের প্রাণ হস্তচ্যুত হ'য়েছিল আর কি! বালিকাকে আমার অদেয় কিছুই ছিল না। কিন্তু কি ক'রব, নিয়মের বশীভূত হয়ে অমন সাধ্বীকেও আমাকে পতি হ'তে বিচ্ছিন্না ক'রতে হ'য়েছে। সন্তান-প্রলোভনে মুগ্ধা হ'য়ে সর্ব্বনাশী মুহূর্ত্তের জন্য জননীরূপিণী স্বামীকে বিস্মৃতা হ'য়েছিল; আমিও সেই অবকাশে পালিয়ে এসেছি।

সাবিত্রী। প্রভু, এস্থানের নাম কি?

যম। য়্যাঁ!

সাবিত্রী। এস্থানের রমণীয়তা আমাকে বড়ই মুগ্ধ ক'রেছে। আমি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দের আভাস পাচ্ছি, যেন কোন অদৃষ্ট পূর্ব্ব মধুময় প্রদেশের সন্নিকটবর্ত্তিনী হ'য়েছি। পবনে মধু, ঋতু মধুময়, ওষধী সকল মধুপূর্ণ। বৃক্ষে বৃক্ষে মধুসঞ্চার! এমন কি, পথের ধূলায় মধু মাখা। এ কোথায় এসে উপস্থিত হলুম দয়াময়?

যম। তুমি এখানে পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করেছ! এস্থান যে মনুষ্যের অগম্য।

সাবিত্রী। ধর্ম্ম যার সহায় ও জীবন-পথের সঙ্গী, ত্রিভুবনে তার অগম্য স্থান কোথায় প্রভু।

যম। তুমি যে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ সাবিত্রী!

সাবিত্রী। আমিত দিয়েছি, কিন্তু আপনি নিজেই যে নিষ্কৃতি গ্রহণ ক'র্‌ছেন না প্রভু! হে দেব! আপনি প্রজ্ঞাচক্ষু—আপনিই বলুন, আমার গতি কোথায়!

যম। নৃপনন্দিনি! আর অগ্রসর হয়োনা—নিবৃত্তা হও। মুহূর্ত্তে তোমার চক্ষে এক মহা অন্ধকারের আবরণ পড়বে। আর আমাকেও দেখ্‌তে পাবেনা, আপনাকেও দেখ্‌তে পাবে না। অগ্রপশ্চাৎ গতিরুদ্ধ হয়ে বিষম সঙ্কটে পতিতা হবে। ফিরে যাও—ফিরে যাও। তোমাতে পরম প্রীতি প্রযুক্তই এই কথা ব'লছি। নতুবা আমার কথা পর্য্যন্ত আর তুমি শুন্‌তে পেতে না। ফিরে যাও—আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব ক'রো না।

সাবিত্রী। আপনি যম; কিন্তু নিজে নিয়ম ভঙ্গ ক'রে নামের সার্থকতা নষ্ট কর্‌ছেন! ধর্ম্মরাজ! এবারে নিজের জন্য নয়—জগতের কল্যাণ-সাধনের জন্য আমি আপনার সঙ্গে চ'লেছি। যেহেতু জগতের ভিত্তিস্বরূপ যে ধর্ম্ম, তিনি যদি চঞ্চল হন, তা হ'লে সমস্ত জগৎ এক মুহূর্ত্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। তাই আমি আপনাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্‌তে এতদূরে এসেছি।

যম! হ্যাঁ! সে কি ব'লছ সাবিত্রী।

সাবিত্রী। আপনি আমাকে শতপুত্রের জননী হবার বর প্রদান ক'রেছেন, অথচ আমার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যকরে নিজেই সে সত্যপালনের অন্তরায় হচ্ছেন। আপনি যম,—চিরদিন নিয়মাধীন। মায়াবশে আপনি আমাকে বরপ্রদান করেন নি। আমার পুণ্যবল আপনাকে আকৃষ্ট ক'রে বরপ্রদানে বাধ্য ক'রেছে। সুতরাং মিত্ররূপে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনি স্বধর্ম্ম পালনের জন্য আমাকে

পঞ্চম বর প্রদান করুন। আমি নিজে ব'ল্‌ছি—সনাতন ধর্ম্মের অস্তিত্ব রক্ষা ক'রে আপনি পুরীপ্রবেশ করুন। নতুবা সেখানে আপনার আর প্রবেশাধিকার নাই।

যম। য়্যাঁ! তুমি কে? কে তুমি? কোন্ ভুবনপালিনী শক্তি ধর্ম্মকে আজ জ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য স্বেচ্ছায় আপনাকে পতিবিয়োগিনী ক'রেছ? মা—মা! উজ্জ্বলতর আলোক সন্নিহিত হ'লে, স্বল্পালোক যেমন অন্ধকারময় হয়, জ্ঞানময়ি! তদ্রূপ তোমার সমীপস্থ হয়ে আমার সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে! ধর্ম্মকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে, কে তুমি করুণাময়ী! তার পুরীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়েছ?

সাবিত্রী। আমি সত্যবানের প্রিয়তমা ভার্য্যা—শাস্ত্রে আমার নাম সতী। আমার অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব। ধর্ম্মরাজ! শাস্ত্রাদেশে আমি তোমাকে আদেশ ক'রছি—আমার পদ গৌরব রক্ষা ক'রে স্বপদে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হও।

যম। মা! এই নাও—সতী! জগতে মহিমা প্রচার করবার জন্য—পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে সৃষ্টিরক্ষার জন্য—তোমার চিরন্তন সামগ্রী পতিধন গ্রহণ কর। আর সেই সঙ্গে আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর। আমি ধন্য—আমার পুরী ধন্য—আর এই অপূর্ব্ব পতিব্রতার মাহাত্ম্যে এই আর্য্যাধিষ্ঠিত যে ভারতভূমি, তিনিও ধন্য।

সাবিত্রী। কতদূরে এসেছি ধর্ম্মরাজ?

যম। মা, আমার প্রিয়তমা দয়িতা! মৃতসঞ্জীবনী পুরীর দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছ। যদিই মা, কৃপা ক'রে এতদূর এসেছ, তা হ'লে একবার তাকে দর্শন কর।

পটপরিবর্ত্তন।

সাবিত্রী। কি সুন্দর—কি অদ্ভুত!—এ কি দেখলুম ধর্ম্মরাজ!

যম। সম্মুখে উত্তপ্তজলা বৈতরণী, তার উপরে ওই মায়া-সেতু।

দেখ্‌ছ মা—কি অপূর্ব্ব বিবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত! পুণ্যাত্মা যখন এই স্থানে উপস্থিত হন, তখন এই সেতু কুসুমাচ্ছন্ন পবিত্র পথ। পাপাত্মারা যখন উপস্থিত হয়, তখন এই সেতু পাপভেদে বিভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করে। ওই দেখ মা—ওই দেখ কাঞ্চনময়। ওই দেখ—ওই দেখ—আবার বিবিধবর্ণ কুসুম-সমাকীর্ণ। ওই দেখ, আবার ভীষণ অগ্নিময়—সঙ্কর্ষণের মুখানলের ন্যায় নীল জিহ্বা বিস্তার ক'রে পাপীকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে। দেখ মা—আবার দেখ—প্রবেশ-পথে অগ্নি-অক্ষরে কি লেখা আছে দেখ—"জীব! এখানে চিন্তা ক'র্‌বার অবসর নাই।" পাপী, সম্মুখে এই কণ্টকাকীর্ণ পথে যেতে সাহস না ক'রে, নদীতে ঝম্প প্রদান করে। আর অমনি উত্তপ্ত জলে দগ্ধ হ'তে হ'তে, জলস্রোতে অন্ধকারময় নরক-কুণ্ডে নিপতিত হয়। মা! এই বারে আমাকে অনুমতি কর। রাত্রি প্রহরাবশেষা—অনুমতি কর মা—পুরী প্রবেশ করি।

সাবিত্রী। করুন।—(যমের প্রস্থান)—তার পর? জ্ঞানশূন্য হয়ে যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে এসেছি। কোন্ পথে এসেছি, কিছুই ত জানি না! এখন কেমন ক'রে ফিরি!—গুরুদেব। কোথায় তুমি? এ সঙ্কটে তুমি ভিন্ন রক্ষা করবার যে আর কেউ নাই। এ প্রাণ-পুষ্পাধার মলিন না হ'তে হ'তে আমাকে ফির্‌তে হবে—কোথায় আছ দয়াময়?—অভাগিনী নন্দিনীকে রক্ষা কর—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর কর। পথ দেখাও—পথ দেখাও।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

মাণ্ডব্য। মা, মা—কই তুমি?

সাবিত্রী। এসেছ—এসেছ—পিতা এসেছ?—কই তুমি? আর যে আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

মাণ্ডব্য। ভয় কি মা, এই যে আমি—এই যে আমি। কই—আমার প্রাণ কই—সাবিত্রী! আমার প্রাণ কই! আমার প্রাণ কই?

সাবিত্রী। এই নাও—শীঘ্র নাও—অঞ্জলি নাও—তব দত্ত সামগ্রী তুমি গ্রহণ কর।

(গীত।)

জীবন-তটিনী-কূলে এসে আবার পাছে ভেসে যাই।
ভয়ে ভয়ে আসি, চরণে দাসী, রাখিল জীবন-কুসুম তাই॥
মুছে নিয়ে গিয়েছিল শমন অকালে ললাট-বিন্দু,
চকিতে চাহিতে দেখি চারিভিতে, অপার আঁধার সিন্ধু,
দূর ভয় কর দয়াময়, আর না হারাই—না হারাই—
অভয় চরণে রাখিনু যতনে, তুলে লও কোলে হে গোঁসাই॥

চতুর্থ দৃশ্য।

অশ্বপতি ও মালবী।

মালবী। কই মহারাজ, সাবিত্রী কই? আমার জামাতা কই? বৃদ্ধ অন্ধ রাজা, আর বৃদ্ধা মহিষী শৈব্যা—তারাই বা কই? ঋষিগণ—তাঁরাই বা কোথায়? সব অন্ধকার! আশ্রম শূন্য। কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব—কাকে আমার জামাতার কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব? কে ব'ল্‌বে—সত্যবান্ বেঁচে আছে, আমার মেয়ে বেঁচে আছে। মহারাজ—মহারাজ! কোথায় যাই? কি করি? সম্মুখে গভীর বন—কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার—কাল আবরণে যেন আমাদের গন্তব্য পথ রোধ ক'রে ব'সে আছে। কি হবে মহারাজ—কি হবে!

অশ্ব। উতলা হয়োনা মহিষী! এক বৎসর থেকে বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছ। বিপদের সম্মুখে এসে আত্মহারা হয়োনা।

মালবী। ওগো অমন কথা ব'লোনা—দোহাই মহারাজ, আশ্বাস দাও। বল, আমার জামাতা বেঁচে আছে—সাবিত্রীর সিঁথের সিন্দুর অটুট আছে।

অশ্ব। কেমন ক'রে থাক্‌বে মহিষী! দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা নয়।

(তুম্বুরু ও মালিনীর প্রবেশ)

তুম্বুরু। কখনই নয়, দেবর্ষি ঠাকুরের বাক্য—সেকি মিথ্যে হবার যো আছে! কি বলিস বউ!

মালিনী। ও বাবা—ঢেঁকি ঠাকুরের কথা মিথ্যা হবে! যেমনি একটী বছর গেছে, অমনি মালার ফুল আবার চন্‌চন্ ক'রে ফুটে উঠেছে।

তুম্বুরু। বাতাস অমনি ফুলের গন্ধ মাথায় ক'রে রন্‌রন্ ক'রে দিদিরাণীর কাছে ছুটে গেছে।

মালিনী। ভোমরা পুটলীর ধারে বন্‌বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে।

তুম্বুরু। আর বউএর প্রাণ ঝন্ ঝন্ ক'রছে—দেবর্ষি ঠাকুরের কথা কি কখন মিথ্যে হয়!

অশ্ব। কিরে তুম্বুরু, কি ব'ল্‌ছিস?

তুম্বুরু। আর বলাবলির সময় নেই মহারাজ! এখন থেকে গলাগলি। দিদিরাণী আর তার বরকে গলায় গলায় মালা দিয়ে বাঁধব, তবে আমরা ঠাণ্ডা হব।

অশ্ব। আ, হতভাগ্য অজ্ঞান! কে তোদের এ বৃথা আশ্বাস দিয়েছে?

উভয়ে। ঢেঁকি ঠাকুর।

মালবী। ঢেঁকি ঠাকুর কি ব'লেছে?

মালিনী। দিদিরাণী আর বরের জন্য মালা গেঁথেছিলুম। ঠাকুর ব'লেছিল—এক বৎসর পরে মালা এখানে নিয়ে আস্‌তে।

তুম্বুরু। দিদিরাণীর বরের নাকি আজ যমের বাড়ী নেমন্ত্রণ আছে! নেমন্ত্রণ সেরে ফিরি আস্‌বে, দিদিরাণীর পাশে ব'স্‌বে, আর আমরাও অমনি মালা নিয়ে হাজির হব।

মালবী। এ সব কি ব'ল্‌ছিস! তুম্বুরু—তুম্বুরু, স্পষ্ট ক'রে বল—

মহামূল্য পুরস্কার দেবো। সত্য ক'রে বল—দেবর্ষি 'ক ব'লেছেন। সাবিত্রীর বর কি বেঁচে আছে ?

তুম্বুরু। বেঁচে আছে—তবে এখনও যমের বাড়ী আছে, কি গাছ-তলায় ফিরে এসেছে, সেটা ব'লতে পারছি না। ওই বাবাঠাকুর আসছে—ওঁর কাছে খবর নাও মহারাজ।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ।)

মালবী। দয়াময়—দয়াময়, কোথায় ছিলে ? তোমার দাসদাসী যে অভয়পদ দেখ্‌তে না পেয়ে জগৎ অন্ধকার দেখ্‌ছিল !

অশ্ব ! দয়াময়, দাসের প্রণাম্ গ্রহণ করুন।

মাণ্ডব্য। কেও—মহারাজ ! কন্যাকে দেখ্‌তে এসেছ ? জামাতাকে দেখ্‌তে এসেছ ? এস মহারাজ, এস রাণী, দেখ্‌বে এস। তোমার নন্দিনী ধর্ম্মরাজকে পরাস্ত ক'রে, তার হাত থেকে স্বামীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে। দেখ্‌বে এস—স্বর্গীয় আলোকে উজ্জলাঙ্গ পতির পাশে সতীরাণীর কি অপূর্ব্ব শোভা !

মালবী। প্রভু—প্রভু, ব'লছেন কি ! বুঝতে পা'রছি না। আমার মাথা ঘুরছে। নন্দিনী জ্ঞানশূন্যা, তাকে রক্ষা করুন।

অশ্ব। ধন্য আমি, এমন কন্যাকে লাভ ক'রেছি। রাণী ! ধন্য তুমি, সাবিত্রীকে গর্ভে ধারণ ক'রেছ। প্রভু ! সে শোভা দেখ্‌বার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছি।

মাণ্ডব্য। আসুন মহারাজ ! তুম্বুরু, তুমি নীরব কেন ? মালা কই ? মালার অপেক্ষায় তোমার দিদিরাণী যে ব'সে আছে। মালিনী, তুমিও নীরব কেন মা !

মালিনী। হাঁ দেবতা—কিছু নীরব আছি। যখন যমের বাড়ী থেকে বর আস্‌ছে, তখন যমদূত গুলো ত বরযাত্র হয়ে এসেছে !